সমাজতান্ত্রিক সমাজের
অর্থনৈতিক বিকাশ



সমাজতান্ত্রিক সমাজের অর্থ নৈতিক বিকাশ

সমাজতান্ত্রিক সমাজের অর্থনৈতিক বিকাশ

এম, ম্যাকারোভা

কালান্তর প্রকাশনী
কলিকাতা ২৯

প্রথম প্রকাশ : ১৫ই আগস্ট ১৯৬৭

প্রকাশক : চিন্মোহন সেহানবীশ
কালান্তর প্রকাশনী
১৯, ডাঃ শরৎ ব্যানার্জি রোড, কলিকাতা ২৯

মুদ্রক : নিউ এজ প্রিণ্টার্স
৫৯, পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা ৯

দাম : এক টাকা

Bengali translation of ECONOMIC DEVELOPMENT OF SOCIALIST SOCIETY by M. Makarova.

আপনা থেকে সমাজতন্ত্র হয় না। সমাজতন্ত্র গড়তে হয়।

সমাজতন্ত্র গঠন মানুষের যুগ যুগ সঞ্চিত স্বপ্ন। ইতিহাসের চলার সঙ্গে পৃথিবী পুনর্গঠনের অনেক অপরিণত তত্ত্বের উদ্ভব হয়েছে যা সমাজ-বিকাশের বাস্তব নিয়মকে অনুধাবন করতে অপারগ হয়েছে।

মানবজাতি অনেক সমাজব্যবস্থার উত্থান এবং পতন দেখেছে। আদিম সমাজে ভাঙন ধরেছে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে, বিভিন্ন সময়ে, উদ্ভব হয়েছে দাস-ব্যবস্থার। বহু শতাব্দীর বিকাশ ও সমৃদ্ধির পর দাস-ব্যবস্থার পতন শুরু হয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত তার স্থান নিয়েছে তুলনায় অধিকতর প্রগতিশীল ব্যবস্থা, সামন্ততন্ত্র। এই ব্যবস্থা কয়েক শতাব্দী ধরে বিরাজ করেছে তারপর তা অকেজো হয়ে পড়েছে, ধনতন্ত্রকে জায়গা ছেড়ে দিয়ে তাকে বিদায় নিতে হয়েছে। ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা উৎপাদনী শক্তিগুলির দ্রুত বিকাশ ঘটাল। উন্নত দেশগুলিতে অত্যন্ত শক্তিশালী অর্থনীতি গড়ে তুলল, সামন্ততান্ত্রিক বিচ্ছিন্নতার অবসান ঘটাল, সমস্ত স্বল্প-উন্নত ও পিছিয়ে-পড়া দেশগুলিকে নিজ কক্ষপথে আকর্ষণ করে গড়ে তুলল বিশ্ব অর্থনীতি।

ন্যায়নিষ্ঠ সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলার স্বপ্ন সফল হয় নি কেন? কেন বহু শতাব্দী ধরে ব্যক্তিগত মালিকানার ভিত্তিতে, মানুষ কর্তৃক মানুষের শোষণের ভিত্তিতে সমাজের বিকাশ ঘটল? যে সমাজে মানুষ মানুষকে শোষণ করবে না, যেখানে প্রতিটি মানুষ নিজের সাধ্য অনুসারে কাজ করবে এবং তার কাজের অনুপাতে পাবে—সে সমাজ গড়ার শুধু ইচ্ছা মনে মনে পোষণ করাই যথেষ্ট নয়—এই সমাজের জন্য প্রয়োজনীয় এবং

উপযুক্ত অবস্থাও গড়ে তোলা আবশ্যক। তার জন্য চাই বড়ো আকারের এবং বেশ উন্নত ধরনের সামাজিক উৎপাদন, যা থেকে সমাজের প্রত্যেকটি সক্ষম মানুষের অর্থকরী কর্মের সংস্থান হবে, সমাজের প্রত্যেকটি মানুষকে মানুষের মতো বাঁচবার সুযোগ দেবার মতো প্রাচুর্যের সৃষ্টি হবে।

সমাজতন্ত্রের স্বপ্নকে সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞান-সম্মত তত্ত্বে প্রতিষ্ঠা করার সেই ন্যায়নিষ্ঠ সমাজ গড়বার কার্যকর পথের নির্দেশ দেবার বাস্তব অবস্থা সৃষ্টি হল তখনই যখন বড়ো আকারের ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের আবির্ভাব হল এবং তারই সঙ্গে সঙ্গে উদ্ভব হল শ্রমিকশ্রেণীর।

অল্লাধিক একশ বছর আগে বিজ্ঞানসম্মত সমাজতন্ত্রের উদ্ভব হয় এবং আজ অনেকগুলি দেশে নতুন সমাজ গড়বার বাস্তব অভিজ্ঞতায় তার মূল তত্ত্বগুলির যাথার্থ্য চমকপ্রদভাবে প্রমাণিত হচ্ছে।

আধুনিক পৃথিবীতে পুরোন সমাজকে অতি দ্রুতগতিতে ভেঙে ফেলা হচ্ছে। ক্রমশ ক্রমশ নতুন নতুন দেশ আর সে সব দেশের হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষ সামিল হচ্ছে স্বাধীনতা ও মুক্তির সংগ্রামে, সর্বপ্রকারের শোষণ এবং নিপীড়নের অবসান ঘটাবার লড়াইয়ে। ধনতন্ত্র আজ এত পরিমাণে তার স্বরূপ প্রকাশ করে ফেলেছে, এত দুঃখ এবং দুর্গতি চাপিয়ে দিয়েছে জনসাধারণের উপর যে যারাই আজ পরিবর্তন চায় তারাই তাদের নতুন সমাজ গড়ার পথ ও পদ্ধতিকে সমাজতন্ত্রের সঙ্গে একাকার করে দেখে। অর্থনৈতিক এবং সামাজিক বিকাশের নানা বিভিন্ন স্তরে অবস্থিত নানা দেশ, যার মধ্যে কোনো কোনোটি এমন কি আধুনিক শিল্পোৎপাদনের স্তরেও পৌঁছয় নি, সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করছে। এইসব দেশগুলিতে অনুন্নত অর্থনীতি সমাজতন্ত্র এবং তার নির্মাণ পদ্ধতি সম্পর্কে এমন কতকগুলি ধারণার সৃষ্টি করেছে যা ঠিক বিজ্ঞানসম্মত নয়।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, কোনো কোনো লোকের ধারণা গোষ্ঠীগত কৃষি, অনেকগুলি দেশে যা বহু শতাব্দাকাল ধরে বিরাজ করেছে তা প্রায় তৈরি সমাজতন্ত্র। অন্য কতকগুলি ক্ষেত্রে উৎপাদন শক্তির উপযুক্ত পরিমাণ বিকাশ না হওয়া সত্ত্বেও, পুরোন সমাজের পুনর্গঠন না করেই সরাসরি সমাজতান্ত্রিক স্তরে উত্তরণের চেষ্টা হচ্ছে। সমাজের সমাজতান্ত্রিক স্তরে উত্তরণ তার পূর্ববর্তী স্তরের বিকাশের চেয়ে স্বতন্ত্র প্রকৃতির। উভয়ের মধ্যে একটি মৌলিক পার্থক্য হল এই যে সমাজতন্ত্রের আবির্ভাব আপনা থেকে হয় না, জনসাধারণকে তা গড়ে তুলতে হয়।

দাসভিত্তিক, সামন্ততান্ত্রিক ও ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার বিকাশ যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে হয় তার কারণ এই যে তা উৎপাদনের উপায়ের ব্যক্তিগত মালিকানার উপর প্রতিষ্ঠিত। উৎপাদন শক্তির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক উৎপাদনের আধারের পরিবর্তন ঘটেছে কিন্তু তার অর্থনৈতিক ভিত্তি সর্বদাই দাস-মালিক, সামন্তপ্রভু বা পুঁজিদারের ব্যক্তিগত মালিকানাই থেকে গেছে। ব্যক্তিগত মালিকানার নানাবিধ রূপ পরস্পর বিরোধী নয়, তাই তা সহাবস্থান করতে পারে। সামন্ত প্রভু অনায়াসে দাস-মালিকের সঙ্গে পাশাপাশি অবস্থান করতে পারে— এতো ঘটনা। আবার ঔপনিবেশিক দেশে আধুনিক বড়ো ধনতান্ত্রিক একচেটিয়াপতি সামন্তপ্রভু এবং দাস-মালিকদের সঙ্গে শুধু যে সদ্ভাব রেখেই চলে তা নয়, তারা নিজেদের শাসন সুদৃঢ় করবার জন্য অচলিত অর্থনৈতিক আধারকে বাঁচিয়ে রাখতে সর্বশক্তি প্রয়োগ করে থাকে।

সমাজতন্ত্র গঠন নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত একটি ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া, নির্দিষ্ট বৈষয়িক উপাদানের সঙ্গে, বিষয়গত ও বিষয়ীগত অবস্থার সঙ্গে যা সম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ।

সমাজতন্ত্রের জয়ের অর্থ হল সাধারণ মালিকানার পরিবর্তে ব্যক্তিগত

মালিকানার প্রতিষ্ঠা, আধিপত্যের সম্পর্কের পরিবর্তে সহযোগিতার সম্পর্ক, সমমর্যাদাসম্পন্ন মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সাহায্যের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা। স্পষ্টতই এমন ধরনের একটি সমাজ ব্যবস্থা আপনা থেকে গজাতে পারে না, পূর্ববর্তী সমাজব্যবস্থার মধ্যে বিকশিত হতে পারে না বা বিভিন্ন ধরনের শোষণমূলক অর্থনীতির সঙ্গে তা সহাবস্থান করতে পারে না।

সমাজতন্ত্রের বৈষয়িক উপাদান যত ভালভাবেই তৈরি থাকুক না কেন তা কখনই আপনা থেকে সমাজতন্ত্রের পথে নিয়ে যেতে পারে না।

সবচেয়ে উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতেও, যেখানে নতুন সমাজের সব উপাদানই মজুদ সেখানেও সমাজতন্ত্র জনসাধারণের বৈপ্লবিক সংগ্রাম ব্যতিরেকে, উৎপাদনকারীদের নিজেদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর ছাড়া আপনা থেকে গজাতে পারে না। উদাহরণত, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে, ব্রিটেনে, ফ্রান্সে, জাপানে ও অন্যান্য অতি উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে সমাজতন্ত্রের বৈষয়িক উপাদান অনেক আগেই তৈরি হয়ে রয়েছে, কিন্তু সেখানে রাষ্ট্রক্ষমতা পুঁজিদারদের হাতেই রয়ে গেছে। ওসব দেশে তাই সমাজতন্ত্রও হয় নি। পূর্ববর্তী সমাজব্যবস্থাগুলির সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক সমাজের মূলগত পার্থক্য রয়ে গেছে। সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠিত উৎপাদনের উপায়ের সাধারণ মালিকানার উপর এবং এ-সমাজে মানুষ কর্তৃক মানুষের শোষণ নেই। বড় সামন্তপ্রভুরা বা পুঁজিদাররা তাদের জমি, কারখানা, রেলওয়ে বা ব্যাঙ্ক স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে কখনও ছেড়ে দেয় না। মানুষের শ্রমই যদিও সমস্ত সম্পদের স্রষ্টা, এই সম্পদের মালিক সে হতে পারে না যতক্ষণ না সে উৎপাদনের উপায়ের ব্যক্তিগত মালিকানা বদলে সাধারণ মালিকানা প্রতিষ্ঠা করার শক্তি অর্জন করতে পারে। তার মানে তাদের রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করতে হবে।

সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা গঠনের পূর্বশর্ত তাহলে শুধু বৈষয়িক উপাদানই নয়, জনসাধারণ কর্তৃক রাষ্ট্রক্ষমতা দখলও।

সমাজতন্ত্রের উদ্ভব আপনা থেকে হতে পারে না, কেননা পুরোন ব্যবস্থায় সাধারণ মালিকানা আপনা থেকে কখনও গজাতে পারে না। সমস্ত উৎপাদকের যৌথপ্রয়াসের দ্বারাই একমাত্র সমাজতান্ত্রিক অর্থ-নীতি গড়ে তোলা সম্ভব অবশ্য এক শর্তে যে রাষ্ট্রক্ষমতা তারা হাতে নিয়ে নিয়েছে।

যখন এক শোষণমূলক ব্যবস্থার স্থান নিয়েছে আর এক শোষণমূলক ব্যবস্থা তখন জনসাধারণ নতুন সমাজকে প্রভাবিত করতে পারে নি, তখন তাদের একমাত্র কাজ ছিল পুরোন সমাজকে ভাঙা। জনসাধারণের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের সচেতন ও সৃজনমূলক কর্মের মধ্য দিয়েই একমাত্র সমাজতন্ত্র গড়া সম্ভব। সমাজতন্ত্র জনসাধারণের সমাজ এবং একমাত্র জনসাধারণই তা গড়তে পারে।

প্রথম সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পাদিত হয়েছিল ১৯১৭ সালের অক্টোবরে, রাশিয়ায়। সেদেশ তখন ছিল ধনতান্ত্রিক বিকাশের মাঝারি স্তর। সামন্ততন্ত্রের অবশেষও বেশ কিছু ছিল সে অর্থনীতিতে। জার-তন্ত্রী রাশিয়ার প্রত্যন্ত প্রদেশে বসতি ছিল পিছিয়ে-পড়া মানুষদের, যারা ধনতান্ত্রিক বিকাশের স্তরে পৌঁছয়ই নি। যখন বিপ্লব সম্পাদিত হয় তখন আজ যে অঞ্চলগুলি কাজাখস্তান, কিরঘিজিয়া, উজবেকিস্তান, তুর্কমেনিয়া ও তাজিকিস্তান নামে পরিচিত সেখানে সামন্ততন্ত্র এমনকি তার চেয়েও পুরোন অর্থনীতি প্রচলিত ছিল। উন্নততর সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রগুলির সহযোগিতায় এবং তাদের সৌভ্রাতৃত্বমূলক সহায়তায় এই সব অঞ্চলের অধিবাসীরা তাদের অর্থনৈতিক পশ্চাদপদতা অতিক্রম করতে সক্ষম হয় এবং ধনতন্ত্রকে পাশ কাটিয়ে উপনীত হয় সমাজতন্ত্রে।

১৯২১ সালে মঙ্গোলিয়ায় সামন্ত বিরোধী, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী বিপ্লব সংঘটিত হয়। মঙ্গোলিয়ায় তখন কোনো শিল্পও ছিল না, শ্রমিকশ্রেণীও ছিল না। তার অর্থনীতি ছিল যাযাবর পশুচারণ নির্ভর। সোভিয়েত ইউনিয়নের সহায়তায় মঙ্গোলিয়া ধীরে ধীরে সমাজতন্ত্রের বৈষয়িক উপাদান গড়ে তোলে। আজ সমাজতন্ত্রই সে দেশের অর্থনীতিতে প্রধান। এইভাবে সোভিয়েত সংঘে যোগ না দিয়েও, তার সমর্থন ও সহায়তার বলে মঙ্গোলিয়া ধনতন্ত্রের স্তরকে পাশ কাটিয়ে 'যাযাবর' সামন্ততন্ত্র থেকে সরাসরি সমাজতন্ত্রে উত্তীর্ণ হয়েছে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর (যাতে ফ্যাশিজমের পতন ঘটে) চীন, ভিয়েতনাম ও কোরিয়ায় সামন্তবিরোধী এবং পরে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সংঘটিত হয়। এই প্রাক্তন উপনিবেশ ও অর্ধ-ঔপনিবেশিক দেশগুলিতে ধনতন্ত্রের বিকাশ হয়েছিল খুব প্রাথমিক স্তরের, সেখানে সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতিরই ছিল প্রাধান্য।

অর্থনীতিতে অনুন্নত যে-সব দেশ ঔপনিবেশিক ও অর্ধ-ঔপনিবেশিক পরাধীনতা থেকে নিজেদের মুক্ত করেছে তারা যখন আজ স্বাধীন বিকাশের পথ গ্রহণ করছে তখন সমাজতন্ত্রী সমাজ গঠনের জন্য জনসাধারণের সচেতন ও সুসংগঠিত বৈপ্লবিক কর্মতৎপরতা আরও অধিক তাৎপর্যমণ্ডিত হয়ে উঠেছে। এই সব দেশের অনেকগুলিতেই বৃহদায়তন শিল্পোৎপাদনের অভাব রয়েছে, যোগাযোগ ব্যবস্থাও দুর্বল। সাম্রাজ্যবাদ লোভীর মত এই সব দেশের সম্পদ ব্যবহার করেছে কিন্তু এই সব দেশে আধুনিক শিল্প গঠনের কোনো চাড় তারা দেখায় নি। অর্ধশতাব্দী পূর্বেও এই সব দেশে সমাজতন্ত্র গঠনের কোন প্রশ্নই উঠত না। কিন্তু আজ বিশ্ব সমাজতন্ত্রী ব্যবস্থার অস্তিত্বের ফলে পরাধীনতার নিগড় মুক্ত দেশগুলির জনসাধারণের প্রাক্-সমাজতন্ত্রী বিকাশের সব কটি স্তরের মধ্য দিয়ে না গেলেও চলে। বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের অধীনতা

থেকে যে-সব জাতি নিজেদের মুক্ত করেছে, বৃহদায়তন উৎপাদন হাতে নেবার ও সমাজতন্ত্র গঠন শুরু করবার পূর্বে কেন তারা দুঃখ ও দুর্দশার বিনিময়ে নিজস্ব ধনতন্ত্র গড়ে তুলতে যাবে?

ঘানা, গিনি, মালি, আলজেরিয়ান পিপল্‌স ডেমোক্রাটিক রিপাবলিক, ইউনাইটেড আরব রিপাবলিক, কেনিয়া এবং অন্যান্য যে-সব দেশ রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করেছে সেখানে আজ উন্নয়নের অধনতান্ত্রিক পথের জন্য সংগ্রাম চালান হচ্ছে। এই পথে ধনতন্ত্রকে পাশ কাটিয়ে ঔপনিবেশিক স্তর থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ সম্ভব।

কিন্তু এই সব কোন দেশেই সমাজতন্ত্র আপনা থেকে গজিয়ে উঠবে না। আমরা আগেই বলেছি পূর্ববর্তী অর্থনৈতিক ব্যবস্থাগুলির মত সমাজতন্ত্রের স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ হয় না। প্রতিটি দেশে সেই দেশের জনসাধারণের সচেতন ও সংগঠিত প্রয়াসে তা গড়ে তুলতে হয়।

সমাজতন্ত্র গঠনের যুগে অর্থ নৈতিক ব্যবস্থা ও শ্রেণীসমূহ

স্থপতি যেমন তার হাতে যে সব উপকরণ থাকে তা দিয়েই বাড়ি বা ইমারত গড়েন, তেমনি পূর্ববর্তী সমাজ থেকে যা পাওয়া যায়—অর্থনৈতিক বিকাশের স্তর, জনসাধারণের শ্রেণীগত বিন্যাস, ইত্যাদি—তাই নিয়েই গড়তে হয় নতুন সমাজতান্ত্রিক সমাজ।

জাদুকরের জাদুদণ্ডের দোলানিতে হাওয়ায় প্রাসাদ গড়ে ওঠে শুধু রূপকথাতেই। বাস্তব জীবনে ওরকম কিছু ঘটে না। যে সমাজ গড়া হচ্ছে তার বৈশিষ্ট্য কী দাঁড়াবে, নির্মাণের প্রকৃতি কী হবে এবং কত সময় লাগবে তা নির্ভর করে উৎপাদিকা শক্তির পরিমাণ এবং গুণের উপর।

বিভিন্ন দেশে সমাজতন্ত্র গঠনের অভিজ্ঞতা বিজ্ঞানকে দেয় সেই উপকরণ যা থেকে নতুন সমাজ নির্মাণের সাধারণ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে একটা ধারণা পাওয়া যায়।

সমাজতন্ত্র গঠনের তত্ত্বের মূল প্রতিপাদ্যগুলি এবারে পরীক্ষা করে দেখা যাক। আমরা ইতিপূর্বেই দেখিয়েছি পূর্ববর্তী সমাজের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সমাজতন্ত্রের উদ্ভব হতে পারে না। এবারে আমরা পরীক্ষা করে দেখব সমাজতন্ত্রের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য—সমাজ-তন্ত্র নির্মাণের জন্য মোটের উপর দীর্ঘ রূপান্তরশীল স্তরের প্রয়োজনীয়তাও সামন্ততান্ত্রিক এবং ছোট কৃষক ও কারিগরি উৎপাদনের মধ্য থেকে ধনতান্ত্রিক মালিকানার উদ্ভব ও বিকাশ হয়। অপেক্ষাকৃত প্রগতিশীল হওয়ায় বড়ো আকারের ধনতান্ত্রিক উৎপাদন অতি দ্রুত গতিতে সমস্ত পুরোন এবং প্রাক্-ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে এবং মোটের উপর বেশ দীর্ঘকাল ধরে তার সঙ্গে সহবাস করেও ব্যক্তিগত মালিকানার বিভিন্ন ধরন সমাজে ধনতন্ত্রের নেতৃত্ব ও নিয়ামক ব্যবস্থা হবার পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে না।

অন্যপক্ষে সমাজতন্ত্র অবস্থান করে উৎপাদনের মূল উপায়গুলির সাধারণ মালিকানার উপর আর এই মালিকানা পূর্ববর্তী সমস্ত মালিকানার ধরনের চেয়ে প্রগতিশীল। কিন্তু যতদিন পুরোন ধরনের অর্থনীতির জের বেশ কিছু পরিমাণে বিদ্যমান থাকবে ততদিন সমাজ-তন্ত্র হবে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাগুলির অন্যতম একটি মাত্র। সমাজতন্ত্র অবশ্য ধীরে ধীরে নেতৃত্ব গ্রহণ করবে। কিন্তু যে অর্থনীতিতে পুরোন ধরনের মালিকানা বজায় থাকে তাকে সমগ্রভাবে সমাজতান্ত্রিক বলা যায় না। তার কারণ এই, যতদিন কোন-না-কোন ধরনের ব্যক্তিগত মালিকানা থাকে, এমন কি তা যদি উৎপাদকদের ব্যক্তিগত শ্রম নির্ভর ক্ষুদে মালিকানাও হয়, ততদিন ধনতান্ত্রিক সম্পর্ক এবং মানুষ কর্তৃক

মানুষের শোষণের (সমাজতন্ত্রে যার কোন স্থান নেই) পুনরুজ্জীবন ও বিকাশের সম্ভাবনা থেকেই যায়।

বহু-ধারার অর্থনীতিকে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে রূপ দিতে বেশ দীর্ঘ সময় লাগে। সমাজতন্ত্র গড়ে তুলতে যে সময়টা লাগে তাকেই বলা হয় রূপান্তরের কাল।

বড়ো আকারের ধনতান্ত্রিক সম্পত্তির জাতীয়করণের মধ্যে দিয়ে লোকরাষ্ট্র যে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি গড়ে তোলে—নতুন সমাজ গঠনে তাই নেতৃত্ব ও পরিচালকের ভূমিকা গ্রহণ করে।

উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে শিল্প, বাণিজ্য ও পরিবহণে বড়ো আকারের ধনতান্ত্রিক উদ্যোগ বিদ্যমান থাকে। এর মধ্যে কোন কোন দেশে আবার কৃষিতেও এই ধরনের উদ্যোগ দেখতে পাওয়া যায়। এই সমস্ত উদ্যোগগুলিকেই প্রথমে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করা হয়। যেহেতু অর্থনীতির সকল শাখা সমাজতান্ত্রিক জাতীয়করণের পক্ষে সমানভাবে প্রস্তুত থাকে না, সেহেতু অর্থনীতির সকল শাখায় নতুন সমাজতান্ত্রিক সেক্টরের ভাগও সমান হয় না। উদাহরণ স্বরূপ সোভিয়েত ইউনিয়নের কথাই ধরা যাক। ১৯২৩ সালে এখানে শিল্পোৎপাদনে সমাজতান্ত্রিক সেক্টরের অংশ ছিল শতকরা ৭৫.৬ ভাগ, খুচরা বাণিজ্যের শতকরা ৪৭.৩ ভাগ, কৃষি উৎপাদনের শতকরা মাত্র ১.৫ ভাগ। সাকুল্যে জাতীয় আয়ের শতকরা মাত্র ৩৫ ভাগ আসত সমাজতান্ত্রিক সেক্টর থেকে। অর্থাৎ দেশের অর্থনীতিতে সামাজতান্ত্রিক সেক্টরের স্থান খুব বড়ো ছিল না কিন্তু তার ভূমিকা এবং গুরুত্ব ছিল অপরিসীম।

বৈষয়িক উৎপাদনের অবস্থাই সমাজতান্ত্রিক সেক্টরের নেতৃত্বের ভূমিকা নির্ধারিত করে দেয়। শিল্প, পরিবহণ, ব্যাঙ্ক, পাইকারি বাজার, ইত্যাদি যা আধুনিক অর্থনীতির ভিত্তি—সমাজতান্ত্রিক সেক্টর

তা নিয়ে গঠিত। অন্য সবগুলি সেক্টরের চেয়ে এটি প্রগতিশীল, এর মালিক জনসাধারণ। এই সেক্টর প্রতিযোগিতামুক্ত এবং এর বিকাশ হয় পরিকল্পনানুসারে। এই সব বৈশিষ্ট্য এবং সুবিধা থাকায় এই সেক্টর সবচেয়ে বেশি মিতব্যয়ী। সমাজতান্ত্রিক উদ্যোগগুলিতে শ্রমের উৎপাদিকা শক্তিও সবচেয়ে বেশি। সমাজতান্ত্রিক সেক্টরকে বাঁচিয়ে রাখে এবং গড়ে তোলে রাষ্ট্র তার সর্বশক্তি দিয়ে আর তার পেছনে থাকে জনসাধারণের সবচেয়ে অগ্রসর অংশ, প্রধানত প্রলেটারিয়েট, যারা সবচেয়ে বেশি সংগঠিত ও বিপ্লবীশ্রেণী।

যদি সব দেশে শুধু বড়ো আকারের ধনতান্ত্রিক উৎপাদনই বিদ্যমান থাকত তাহলে শ্রমিকশ্রেণীর হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা আসার পর সমাজতন্ত্র নির্মাণ অনেক সহজ হত এবং সময়ও কম লাগত। কিন্তু ঘটনা তা নয়। এমন কি অত্যন্ত উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশেও বৃহৎ বুর্জোয়াদের নানাবিধ উদ্যোগ, ব্যাঙ্ক, ইত্যাদির পাশাপাশি অবস্থান করে নানা ধরনের প্রাক্-ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি। এই সব অর্থনীতির মালিক—ক্ষুদে চাষী, কারিগর, দোকানদার, ইত্যাদি ছোটখাট মালিক। এইসব ছোটখাট অর্থনীতি বাজেয়াপ্ত করা সম্ভব নয়, কেননা এগুলির মালিক মেহনতি জনসাধারণ। কিংবা এগুলি কিনে নিয়ে এবং এ-সবের মালিকেরা এ অর্থনীতি থেকে যে আয় করত তার নিশ্চয়তা দিয়ে রাষ্ট্রায়ত্ত উদ্যোগে তাদের কর্মসংস্থান করে এগুলিকে রাষ্ট্রায়ত্ত উদ্যোগেও পরিণত করা যায় না। এটা সম্ভব নয়, কেননা এই সব অর্থনীতির অস্তিত্বই প্রমাণ করে যে উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ পর্যাপ্ত নয়। যদি সমস্ত ছোট উৎপাদকেরা তাদের সম্পত্তি দিয়ে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের কর্মী হতে প্রস্তুতও থাকে তাহলেও রাষ্ট্র এই কাজ করতে পারে না।

ছোট অর্থনীতিগুলিকে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে পরিণত করার শুধু ইচ্ছা থাকলেই হয় না। আনুষ্ঠানিকভাবে, আইন জারি করে

কাগজে কলমে এই সব ছোট অর্থনীতিগুলিকে হয়তো সামাজিক সম্পত্তিতে পরিণত করা যায়, হয়তো তাকে করা যায় রাষ্ট্রায়ত্ত অর্থনীতি কিন্তু কার্যত সেগুলি ছোটই থাকবে, থাকবে সেখানে পুরোন সাজ-সরঞ্জাম, পুরোন শ্রম সংগঠন, বিচ্ছিন্ন উৎপাদকেরা ছোটোখাটো উদ্যোগেই কাজ করতে থাকবেন। অর্থনীতি কী ধরনের হবে তা নির্ভর করে উৎপাদিকা শক্তি কী রকম তার উপর।

তাই বিপ্লবের পর এই ধরনের ছোট অর্থনীতির বড় অংশটাই ব্যক্তিগত সম্পত্তি থেকে যায়, যাকে বলা হয়, ছোট পণ্য শাখা রূপে অর্থাৎ সেই ধরনের অর্থনীতি যাতে উৎপাদক প্রধানত নিজের জন্য এবং অংশত বিক্রির জন্য উৎপাদন করে (কৃষি) কিংবা পুরোপুরিই বিক্রির জন্য উৎপাদন করে (কারিগর)। এসব ক্ষেত্রে তারা যেসব যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে স্বভাবতই তা হয় আদিম ধরনের, তাদের শ্রমের উৎপাদিকা শক্তিও হয় কম এবং বৃহৎ শিল্পের সঙ্গে তাদের উৎপাদন এবং বাণিজ্যের সম্পর্কও হয় দুর্বল এবং অস্থির।

অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে, সমাজতন্ত্র নির্মাণের যুগে ছোট পণ্যের শাখা অর্থনীতির একটা বেশ বড় অংশ জুড়ে থাকে। উদাহরণত, সোভিয়েত রাশিয়ায় ১৯২৪ সালে শিল্প উৎপাদনের শতকরা পঞ্চাশ ভাগ এবং কৃষি উৎপাদনের বড় অংশটাই এসেছিল এই শাখা থেকে।

ক্ষুদ্র পণ্য উৎপাদন তার অর্থনীতিক স্বভাবের বশেই ধনতান্ত্রিক পণ্য উৎপাদনে পরিণত হতে চায়; ছোট অর্থনীতির একাংশ ক্রমশ ধ্বংস হয়ে যায় আর অপর এক অতি ক্ষুদ্র অংশ সমৃদ্ধিশালী হয়ে ওঠে। তাই যতদিন এই ক্ষুদ্র পণ্য শাখার অস্তিত্ব থাকবে ততদিন ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির অস্তিত্ব এবং পুনরুজ্জীবনের ক্ষেত্র বিদ্যমান থাকবে। বিজয়ের পর সমস্ত দেশেই অবধারিতভাবে অর্থনীতি তিনটি শাখায় বিভক্ত হয়ে যায়: নতুন সমাজতান্ত্রিক শাখা, পুরোন ছোট

পণ্যের শাখা এবং তার ভিত্তিতে ব্যক্তিগত মালিকানার ধনতান্ত্রিক শাখা।

রূপান্তরকালের অর্থনীতিতে ব্যক্তিগত মালিকানাভিত্তিক ধনতান্ত্রিক শাখার অংশ খুব বড় নয়। উদাহরণত, ১৯২০ সালের মাঝামাঝি সময়ে সোভিয়েত ইউনিয়নে এই শাখার অংশ শতকরা ৯। ভাগের অধিক ছিল না। গ্রামাঞ্চলে খামারগুলির শতকরা মাত্র ৪।৫ ভাগ ছিল ধনতান্ত্রিক ব্যক্তিগত মালিকানার অধীন, কিন্তু শহরের বাজারে যা বিক্রি হত সেই বাজারজাত শস্যের শতকরা ২০ ভাগ উৎপন্ন করত তারা।

অর্থনীতিতে ব্যক্তিগত মালিকানাভিত্তিক ধনতান্ত্রিক শাখার অংশ অপেক্ষা অবশ্য তার ভূমিকা অনেক বড়। তার কারণ হচ্ছে এই যে এমন কি বিপ্লবের পরেও তাদের পুঁজির একাংশ বুর্জোয়াদের হাতেই থেকে যায় এবং তাদেরই আছে উদ্যোগ সংগঠন এবং পরিচালনের অভিজ্ঞতা। উৎখাত হওয়া সত্ত্বেও, তারা ধনতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে তাদের পুরোন যোগসূত্রগুলি বজায় রাখার চেষ্টা করে। আর ধনতান্ত্রিক দেশগুলির সর্বদাই চেষ্টা হল অর্থনৈতিক চাপের (উদাহরণস্ব, অর্থনৈতিক অবরোধ) সাহায্যেই শুধু নয়, সামরিক শক্তির সাহায্যেও, এমন কি সমাজতন্ত্র গঠনরত দেশের উপর প্রত্যক্ষ আক্রমণ চালিয়ে, পুরোন ব্যবস্থার পুনঃপ্রবর্তন। ক্ষমতাচ্যুত হয়েছে কিন্তু পুরোপুরি পরাজিত হয় নি এরূপ বুর্জোয়ারা যথেষ্ট শক্তি ধরে, কারণ ক্ষুদ্র পণ্যউৎপাদন যা সর্বদা নতুন নতুন বুর্জোয়া উৎপাদন সৃষ্টি করে তাদের শক্তি যোগায়।

কোনো কোনো দেশে, তাদের বিশিষ্ট ঐতিহাসিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার জন্য, অন্যান্য অর্থনৈতিক শাখাও থাকতে পারে, উদাহরণস্ব, গোষ্ঠীগত অর্থনীতি, অর্থাৎ অনুন্নত ব্যক্তিগত স্বাভাবিক অর্থনীতি, বাজারের সঙ্গে যার কোন যোগ নেই।

বিপ্লবের পর বিভিন্ন দেশে রাষ্ট্রীয় ধনতান্ত্রিক শাখাও অর্থনীতিতে একটি বিশিষ্ট ভূমিকা নেয়। এই ভূমিকা নানা ধরনের হতে পারে। উদাহরণত, বৃহদায়তন ধনতান্ত্রিক উদ্যোগগুলির রাষ্ট্রীয়করণের পর একটি লোকরাষ্ট্র হয়তো দেখতে পেতে পারে যে ঐগুলি চালাবার মতো অর্থ তাদের নেই, অভিজ্ঞতারও অভাব। এই সব বা অন্য কোনো কারণে এই উদ্যোগগুলি তারা পুঁজিপতিদের কাছে একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য লীজ দিতে পারে এই শর্তে যে তারা উৎপাদন বাড়াবে, নির্দিষ্ট হারে কর দেবে এবং লাভেরও একাংশ দেবে রাষ্ট্রকে। প্রয়োজন হলে রাষ্ট্র এই সব উদ্যোগকে কাঁচা মাল সরবরাহ করবে এবং একটা নির্দিষ্ট দামে বাজারের নিশ্চয়তা দেবে। মিশ্র উদ্যোগগুলিও অনুরূপ চরিত্রের। এখানেও রাষ্ট্র এবং পুঁজিপতি উৎপাদন ও মুনাফার অংশীদার। বৃহদায়তন ধনতান্ত্রিক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান পণ্য বেচা কেনা, পাইকারী ও খুচরা মূল্যের স্তর, কর, ইত্যাদি সম্পর্কে রাষ্ট্রের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়ে রাষ্ট্রীয় ধনতান্ত্রিক উদ্যোগের কাজ করতে পারে।

রাষ্ট্রীয় ধনতন্ত্রের চেহারার আরও রকমফের হতে পারে কিন্তু তাদের চরিত্র এক এবং অভিন্ন। আর তা হল এই যে এগুলি ধনতান্ত্রিক উদ্যোগ ছাড়া কিছু নয় কিন্তু এগুলি পরিচালিত হচ্ছে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে এবং নির্দেশে, তার দাবি এবং নিয়ম মেনে এবং এগুলি ব্যবহৃত হচ্ছে নতুন সমাজ গড়ার কাজে।

ব্যক্তিগত ধনতন্ত্র অপেক্ষা রাষ্ট্রীয় ধনতন্ত্র শ্রেয় কেননা এর বিকাশ জনসাধারণের স্বার্থে রাষ্ট্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। কিন্তু ব্যক্তিগত ধনতান্ত্রিক উদ্যোগকে নিয়ন্ত্রণ করা অনেক কঠিন, কারণ তারা রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত উৎপাদন, মূল্য এবং কর এড়িয়ে চলবার চেষ্টা করে।

বিপ্লবের আগে যে দেশ যত অনুন্নত থাকে, যে দেশের অর্থনীতিতে ক্ষুদ্র পণ্য এবং সাধারণভাবে প্রাক্-ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের অংশ যত

বেশি থাকে, বিপ্লবের পর সেই দেশে ধনতন্ত্রের রাষ্ট্রায়ত্ত রূপটির প্রয়োজনীয়তা তত বেশি দেখা দেয়।

সোভিয়েত ইউনিয়নে রাষ্ট্রায়ত্ত ধনতান্ত্রিক বিভাগের অংশ এবং ভূমিকা উপেক্ষণীয় ছিল। তার কারণ অনেকদিন পর্যন্ত দেশীয় ও বিদেশী পুঁজিদাররা বিশ্বাস করত এই ব্যবস্থা স্থায়ী হবে না। তাই তারা শিশু এবং সেকালের পৃথিবীর একমাত্র শ্রমিক-কৃষক গভর্নমেণ্টের সঙ্গে কোন প্রকারের চুক্তিতে আসতে অস্বীকার করে।

যে-সব দেশ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর সমাজতন্ত্র নির্মাণ শুরু করে সেই সব দেশে রাষ্ট্রায়ত্ত ধনতন্ত্রের পক্ষে জমি অনেক উর্বর ছিল। বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার অস্তিত্ব অনেকগুলি দেশকে সফলভাবে রাষ্ট্রায়ত্ত ধনতন্ত্র ব্যবহারের সুযোগ করে দেয়।

উপরে যে সব কথা বলা হল তা থেকে বোঝা যায় উৎপাদন-ব্যবস্থার বিকাশের যে-বাস্তব অবস্থা বিদ্যমান রয়েছে তার ফলে যে-সব দেশ সমাজতন্ত্রের পথ গ্রহণ করেছে সেই সব দেশের অর্থনীতি অনিবার্যভাবে একাধিক শাখায় বিভক্ত হয়ে পড়েঃ সমাজতান্ত্রিক সাধারণ মালিকানার ভিত্তিতে গড়ে-ওঠা নতুন শাখাসমূহ এবং ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত এবং ধনতান্ত্রিক মালিকানা ভিত্তিক পুরোন শাখাগুলি। বিপ্লবের পর যেহেতু তাদের বিকাশের ঝোঁক পরস্পর বিরোধী সেহেতু সমাজতান্ত্রিক ও ব্যক্তিগত মালিকানার দীর্ঘকাল সহাবস্থান সম্ভব নয়, ফলত সমাজতন্ত্র গঠনের বাস্তব সম্ভাবনাই শুধু যে সেখানে থাকে তা নয়, পুরান ব্যবস্থায় পুনরাবর্তনের সম্ভাবনাও থেকে যায়। যে দেশ শিল্পোন্নয়নের দিক থেকে যত অনগ্রসর, ছোটো আকারের ব্যক্তিগত উৎপাদনের অংশ এবং গুরুত্ব যেখানে যত বেশি সেদেশে সমাজতন্ত্র গড়া তত বেশি কঠিন, ধনতান্ত্রিক বিকাশের সম্ভাবনা সেখানে তত প্রবল।

যে দেশে ধনতন্ত্র বিকাশের বেশ উচ্চ স্তরে পৌঁছেছে, বিশেষ করে

যে দেশে শক্তিশালী এবং অভিজ্ঞ বুর্জোয়াশ্রেণী আছে এবং রাষ্ট্রের বলপ্রয়োগের যন্ত্র (সৈন্যদল, পুলিস, ইত্যাদি) বেশ বড় আকারের সে দেশে বিপ্লব শুরু করা কঠিন। কিন্তু এসব দেশে সমাজতন্ত্র গঠনের প্রক্রিয়া নিশ্চয়ই অনেক সহজ হবে, কেননা প্রয়োজনীয় বৈষয়িক উপকরণ এখানে অনেক বেশি আছে। অপেক্ষাকৃত অনুন্নত দেশগুলিতে যেখানে শ্রমিকশ্রেণী অপেক্ষাকৃত বেশি শোষিত এবং বুর্জোয়াশ্রেণী অপেক্ষাকৃত অপরিণত সে সব দেশে বিপ্লব শুরু করা অপেক্ষাকৃত সহজ হবে কিন্তু সে দেশে সমাজতন্ত্র গড়ে তুলতে অনেক বেশি মেহনতের প্রয়োজন হবে, এবং উন্নত দেশের তুলনায় সময়ও বেশি লাগবে।

যাই হোক, এই সব বৈচিত্র্য সত্ত্বেও, যে-সব দেশ সমাজতন্ত্রের পথ গ্রহণ করেছে তাদের অর্থনীতিতে অনিবার্যভাবেই বহু শাখা থাকবে।

সমাজতন্ত্রের জয়ের বাস্তব সম্ভাবনা এবং ধনতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠার বিপদ কাটিয়ে ওঠা নির্ভর করবে নতুন প্রগতিশীল ও পুরাতন শক্তিগুলির পারস্পরিক সংগ্রামের প্রক্রিয়ার উপর। সমাজতন্ত্র না ধনতন্ত্র—কে কাকে পরাজিত করবে সেই প্রশ্নের মীমাংসা রূপান্তরকালীন অবস্থাতেই করতে হবে। যখন সমাজতন্ত্র আর অনেকগুলি অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অন্যতম একটি মাত্র থাকবে না, সমগ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থাতেই তা পরিব্যাপ্ত হবে তখনই সমাজতন্ত্রের জয়ের কথা বলা সম্ভব হবে। আর তার অর্থ হবে, ধনতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে রূপান্তরের অবস্থার সমাপ্তি ঘটল।

সুতরাং আমরা সিদ্ধান্ত করতে পারি, যেহেতু সমাজতন্ত্র সামাজিক মালিকানার উপর প্রতিষ্ঠিত সেহেতু বিপ্লবের পূর্বে, পূর্বতন সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে বা বিপ্লবের পরে আপনা থেকে তার উদ্ভব হতে পারে না। সমাজতন্ত্র নির্মাণের জন্য চাই একটা রূপান্তরশীল অবস্থা। রূপান্তরকালীন অবস্থায় বহু বিভাগ বিশিষ্ট অর্থনীতিতে সমাজতন্ত্র ও

ধনতন্ত্র উভয়ের বিকাশেরই বাস্তব অবস্থা বিদ্যমান থাকে। উন্নয়নের সমাজতান্ত্রিক পথই জয়যুক্ত হবে কিনা এই প্রশ্নের মীমাংসা নির্ভর করে ক্ষমতায় আসীন শ্রেণীগুলির অর্থনৈতিক নীতি সঠিক কিনা এবং সমাজতন্ত্র গঠনে জনসাধারণের নিঃস্বার্থ সৃজনমূলক কর্মের উপর। সাধারণভাবে এই হল সমাজতন্ত্র গঠনের উপাদান ও তার জয়ের তত্ত্ব।

কিন্তু কোনো তত্ত্ব যতই সঠিক এবং সুগভীর হোক না কেন, বাস্তবতা সর্বদাই তারও চেয়ে জটিল এবং সমৃদ্ধ। সমাজতন্ত্রের তত্ত্ব এবং সমস্ত বিজ্ঞানের তত্ত্ব সম্পর্কেই একথা সত্য।

ধনতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে রূপান্তরকালীন অবস্থার সমস্যাবলী সমাজতন্ত্রের রাষ্ট্রীয় অর্থনীতিতে সবচেয়ে প্রকট। যে-সব দেশে সমাজতন্ত্র জয়যুক্ত হয়েছে তা যখন ধনতন্ত্র থেকে নতুন সমাজের দিকে অগ্রসর হল তখন সে সব দেশে একের সঙ্গে অপরের শিল্পোন্নয়নের মানের যথেষ্ট তারতম্য ছিল, এক এক দেশে জনসংখ্যায় শ্রমিকশ্রেণীর হার ছিল এক এক রকম, তাদের অর্থনীতিতে বিদেশী-বিনিয়োগের হারেও ছিল যথেষ্ট পার্থক্য। কিন্তু এই সব পার্থক্য সত্ত্বেও এই দেশগুলিতে সমাজতন্ত্র গঠন নির্ভর করেছে পুরোন, বুর্জোয়া সমাজ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া বৈষয়িক সম্পদের উপর।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার দ্রুত পতনের ফলে অনেকগুলি দেশ স্বাধীন বিকাশের পথ গ্রহণ করেছে। কিন্তু উপনিবেশবাদীদের দীর্ঘকালের শাসনের ফলে তাদের অধিকাংশতেই শিল্পের বিকাশ হয়নি, শ্রমিকশ্রেণী সংখ্যায় অল্প, অর্থনীতিতে পুরোন, আদিম গোষ্ঠীগত উৎপাদন পদ্ধতি সহ প্রাক্-ধনতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতিরই প্রাধান্য।

অনেকগুলি দেশই এই পর্যায়ে পড়ে।

১৯৬৩ সালের গোড়ার দিকে বিশ্বের জনসংখ্যা ছিল ৩১৫ কোটি

আর তা বিভক্ত ছিল নিম্নলিখিতভাবে : বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক শিবিরের অন্তর্গত দেশসমূহে ৩৫·৩ শতাংশ, বৃহৎ সাম্রাজ্যবাদী দেশ ও তার উপনিবেশসমূহে ১৬·৬ শতাংশ, অন্যান্য উপনিবেশ ও অর্ধ-উপনিবেশ-সমূহে ১·৭ শতাংশ এবং ৪২·৪ শতাংশ অর্থাৎ পৃথিবীর জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক প্রাক্তন উপনিবেশ ও অর্ধ-ঔপনিবেশিক দেশগুলিতে যা স্বাধীনতা অর্জন করে স্বাধীন বিকাশের পথ গ্রহণ করেছে। এই দেশগুলি পৃথিবীর সর্বমোট জমির ৫৫·৭ শতাংশ জুড়ে আছে। দীর্ঘ এবং তিক্ত সংগ্রামের পর এই সব দেশের মানুষেরা সাম্রাজ্যবাদী দেশ-গুলির কাছ থেকে রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য অর্জন করেছে। এখন তারা পথ খুঁজছে কী করে মানুষের মত নতুন জীবন গড়ে তোলা যায়।

যে-সব দেশ সমাজতন্ত্রের দিকে অগ্রসর হচ্ছে ধনতন্ত্র থেকে নয়, সামন্ততন্ত্র, এমনকি তারও পূর্ববর্তী উৎপাদন পদ্ধতি থেকে—সেই সব দেশের রূপান্তরকালীন অর্থনীতি অপেক্ষাকৃত উন্নত দেশগুলির অর্থ-নীতি থেকে অনেক পরিমাণে স্বতন্ত্র হবে অনিবার্যভাবেই।

সাম্রাজ্যবাদীরা উপনিবেশ ও অর্ধ-ঔপনিবেশিক দেশের অর্থনীতিতে অনুপ্রবেশ করেছে শিল্প ও আধুনিক পরিবহণ ব্যবস্থার বিকাশ ঘটিয়ে বা কৃষির জন্য আধুনিক যন্ত্রপাতি সরবরাহ করে অর্থাৎ উৎপাদনশীল পুঁজির রূপে নয়, আদিম ব্যবসায়ের ও মহাজনী পুঁজি রূপে, জাতীয় অর্থনীতিতে যার অবদান অতি সামান্য। তারা এই সব উপনিবেশ থেকে যত পারে মুনাফা নিংড়ে নিয়ে গেছে কিন্তু জাতীয় উৎপাদন যেই তিমিরে সেই তিমিরেই রয়ে গেছে। সেকেলে শ্রমপদ্ধতির একটুও পরিবর্তন হয় নি। একটা উদাহরণ নেওয়া যাক। ফরাসীদের কাছ থেকে সুদান যখন স্বাধীনতা অর্জন করে তখন তা ছিল মুখ্যত একটি কৃষি-নির্ভর দেশ। আজ যখন সেই প্রাক্তন উপনিবেশ থেকে উদ্ভূত

মালি প্রজাতন্ত্র নতুন জীবন গড়ে তোলার পথ সন্ধান করছে তখন তার প্রভাব অনুভূত হবেই। দেশের জনসংখ্যার দশ ভাগের ন' ভাগেরই জীবিকা কৃষিকাজ, দশ ভাগের এক ভাগেরও কম শহরে বাস করে। শিল্পের এখনও ভ্রূণাবস্থা। ১৯৫৮ সালে জাতীয় উৎপাদনের শতকরা দুই শতাংশেরও কম এসেছে শিল্পোৎপাদন থেকে। যদিও কৃষিকার্যই জনসাধারণের জীবিকা অর্জনের প্রধান উপায়, তা অত্যন্ত পশ্চাদপদ। কৃষির প্রধান যন্ত্র নিড়ানি, দেশীয় ভাষায় যাকে বলা হয় 'দাবা'। এমন কি লাঙলও দুষ্প্রাপ্য। অনেক এলাকায় প্রতি ৩০০ জন অধিবাসী পিছু একটি কি দুটি লাঙল আছে।

কেনিয়ার মানুষেরাও সাম্রাজ্যবাদের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছে অনুন্নত এক অর্থনীতি। এখানকার জাতীয় উৎপাদনের সাত ভাগের মাত্র একভাগ এসেছে শিল্পোদ্যোগ থেকে কিন্তু কৃষি থেকে এসেছে ৪০ শতাংশেরও বেশি। কিছু বিদেশী, প্রধানত ব্রিটিশ কোম্পানি কৃষি এবং অর্থনীতির অন্যান্য শাখার চাবিকাঠিগুলি হস্তগত করে রেখেছে। সেরা জমিগুলি ইওরোপীয়ানরা কুক্ষিগত করে রেখেছে আর আফ্রিকানদের যেসব রিজার্ভ অঞ্চলে বাস করতে হয় তা কৃষি বা পশু-পালন কোনোটার পক্ষেই তেমন উপযোগী নয়। আফ্রিকান কৃষি শ্রমিকের জমির প্লটের গড় আয়তন ১·৫-২ হেক্টর কিন্তু ইওরোপীয় কৃষকের গড় জমির পরিমাণ সেখানে ৪০০ থেকে ৮০০ হেক্টর। লর্ড ডেলামেয়ার-এর মতো জমিদার এবং ইস্ট আফ্রিকা সিণ্ডিকেটের মত বৃহৎ কোম্পানির সেখানে ১০০,০০০ থেকে ১৫০,০০০ হেক্টর জমিতে কফি ইত্যাদি রপ্তানীযোগ্য শস্য উৎপন্ন হয়।

আফ্রিকার অন্যান্য দেশের মতো কেনিয়াতেও দেখা যায় বহু ধরনের অর্থনীতি প্রচলিত রয়েছে। একদিকে যেমন আছে গোষ্ঠীগত এবং ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত কৃষি অন্যদিকে তেমন আছে বৃহদায়তন

ধনতান্ত্রিক উদ্যোগ যাতে বহুসংখ্যক আফ্রিকান কৃষি-শ্রমিক কর্মে নিযুক্ত।

আফ্রিকার প্রাক্তন উপনিবেশগুলির বাণিজ্যধারাকে একটি পীরামিডের সঙ্গে তুলনা করা যায়। এই পীরামিডের চুড়োয় রয়েছে ইওরোপীয় আমদানি-রপ্তানি কোম্পানিগুলি যারা বৃহদাকার পাইকারী ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে। পীরামিডের মধ্যস্থলে রয়েছে ক্ষুদ্রাকার পাইকারী বাণিজ্যে লিপ্ত ইওরোপীয় ব্যবসায়ীরা এবং ক্ষুদ্রাকার পাইকারী ও খুচরা কারবারে লিপ্ত সিরিয়ান—লেবানিজ ও আফ্রিকান জাতিভুক্ত (দিয়ুলা) ব্যবসায়ীরা। এই পীরামিডের পাদদেশ হল আফ্রিকান ব্যবসায়ীরা যারা ক্ষুদ্রাকার খুচরো কারবার চালিয়ে জীবিকা অর্জন করে থাকে। পণ্যের অধিকাংশই (সাবান, দেশলাই, সুতো, ছুঁচ, মোমবাতি, চিনি) ক্রেতাদের কাছে পৌছয় আফ্রিকান পাইকার ও দোকানদার মারফত।

১৯৫৬ সালে ফরাসী-অধিকৃত পশ্চিম আফ্রিকায় মোট মুনাফার ৩১ শতাংশ পেয়েছে আমদানি-রপ্তানি কোম্পানিগুলি, ৩০ শতাংশ ইওরোপীয় বণিকেরা, ২০ শতাংশ সিরিয়ান এবং দিয়ুলা আর সবচেয়ে বড় অংশ আফ্রিকান খুচরো কারবারীরা মাত্র ১৯ শতাংশ। এইভাবে মুনাফার তিন ভাগের প্রায় দু' ভাগই গেছে ইওরোপীয়ানদের পকেটে।

পূর্বতন উপনিবেশগুলি আজ তাদের নব বিকাশের স্বার্থে কোন্ বাস্তব ঘটনাবলীর সুযোগ গ্রহণ করতে পারে?

যে-সব দেশের ক্ষেত্রে বাণিজ্যই ছিল অর্থনৈতিক শোষণের প্রধান ক্ষেত্র, যেখানে বিদেশী পুঁজি তার শাসন চালিয়েছে, সেখানে নতুন সরকার স্বভাবতই আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের প্রধানতম কেন্দ্রগুলি রাষ্ট্রায়ত্ত করতেই তার দৃষ্টি ও শক্তি নিয়োজিত করে। উদাহরণ-স্বরূপ

দেখানো যায়, ১৯৬০-এর অক্টোবরে মালি-তে প্রধান দ্রব্যসমূহের রপ্তানির একচেটিয়া অধিকারসহ সোমিয়েক্স্ কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ, কারণ রপ্তানিতে প্রাপ্ত অর্থই জাতীয় আয়ের বৃহত্তর যোগান ক্ষেত্র। দেশের বাজারের যাবতীয় শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদা মেটে আমদানি থেকেই।

অনেক দেশেই জাতীয় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করে সমগ্র অর্থ ব্যবস্থাকেই রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীন করা হয়েছে। ঋণ দেওয়ার ব্যাপারে এই ব্যাঙ্কগুলি রাষ্ট্রীয় বা সমবায় উদ্যোগে পরিচালিত প্রতিষ্ঠানসমূহকেই অগ্রাধিকার দেয়।

এই ভাবেই ব্যবসাবাণিজ্যের প্রধান অর্থনৈতিক কেন্দ্রবিন্দুগুলি রাষ্ট্রের করায়ত্ত হচ্ছে। সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র, ব্রহ্মদেশ, মালি ও অন্যান্য দেশে অতীতে বিদেশী পুঁজিবাদীদের অধিকারাধীন বিদ্যুৎ-শক্তিকেন্দ্র এবং বড় বড় শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহ রাষ্ট্রের আয়ত্তে চলে এসেছে।

উদাহরণত, ১৯৬২ সালের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যেই সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র শতকরা ৯০ ভাগ শিল্পপ্রতিষ্ঠানই জাতীয়করণ করে ফেলেছেন, এবং অন্তর্দেশীয় ও বহির্দেশীয় বাণিজ্যে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছেন। গিনিতে বিদেশী ব্যাঙ্ক, জীবনবীমা ও পরিবহণ প্রতিষ্ঠান এবং খনিব্যবসার কয়েকটি শাখা জাতীয়করণের আওতায় এসে গেছে। বিকাশের নতুন পথে অগ্রসর দেশগুলিতে অর্থনীতির ক্ষেত্রে অগ্রণী ও পথনির্দেশক ভূমিকায় এইভাবেই রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের স্থান স্বীকৃত হচ্ছে। অর্থনীতিক জীবনে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামেরই উত্তরপর্ব। অনেক দেশে অতীতে শক্তিমান বিদেশী একচেটিয়া ব্যবসায়ের বিরুদ্ধে আঘাত হানার এইটিই একমাত্র প্রত্যক্ষ পন্থা। কিন্তু কেবল শিল্পগত, বাণিজ্যগত ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান-

সমূহ জাতীয়করণ করেই রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের সৃষ্টি হয় না, সঙ্গে সঙ্গেই রাষ্ট্রীয় খরচে নতুন শিল্প-প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠাও করতে হয়।

বিকাশমান, দেশসমূহের অর্থনীতিতে রাষ্ট্রের আয়ত্তাধীন উপকরণসমূহ সংগঠিত করে অর্থনীতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শাখাগুলিতে তাদের নিয়োজিত করা এবং ব্যক্তিগত মালিকানাধীন পুঁজিবাদী অর্থনীতিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে দেশের মধ্যে সীমিত করার কাজে সবচেয়ে কার্যকর শক্তিরূপে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্র এক অত্যন্ত প্রগতিশীল ভূমিকা পালন করে।

ভিন্ন ভিন্ন দেশে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের অর্থনৈতিক চরিত্র ভিন্নরূপ। এই প্রসঙ্গে জোর দিয়ে বলা প্রয়োজন যে বিদেশী একচেটিয়া শক্তিবর্গের সঙ্গে সহায়তায় রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা বিপজ্জনক, কেননা এতে আনুষ্ঠানিক রাজনৈতিক স্বাধীনতা থাকা সত্ত্বেও সাম্রাজ্যবাদের উপর দেশের অর্থনৈতিক নির্ভরতা অব্যাহত থেকে যায়।

অ-পুঁজিবাদী বিকাশের দিকে দেশের ক্রমাগ্রগমনের সঙ্গে সঙ্গেই রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রও ধাপে ধাপে আধা-সমাজবাদী বা সমাজবাদী হয়ে উঠতে পারে। এটা অবশ্য নির্ভর করবে সরকারের চরিত্র এবং রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্র কার স্বার্থ দেখছে, তারই উপর। যেখানে ক্ষমতা জনসাধারণের হাতে, এবং অর্থনীতি তাদেরই স্বার্থে বিকশিত হচ্ছে, সেখানে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্র সমাজবাদী হয়ে ওঠে।

উদাহরণত, মঙ্গোলীয় জনগণের প্রজাতন্ত্রে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্র তার সৃষ্টি থেকেই সমাজবাদী ধারায় পরিকল্পিত। যে-সব আফ্রিকান দেশে জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী দুর্বল, নয়তো অনুপস্থিত, সেখানে রাষ্ট্র-পুঁজিবাদের একটি বিশেষ চেহারা গ্রহণ না করে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্র আধা-সমাজবাদী রূপ গ্রহণ করে।

যে-সব দেশ অপুঁজিবাদী পথ গ্রহণ করেছে, সেই সব দেশের

অর্থনৈতিক বিকাশে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের গঠন ও শক্তিবৃদ্ধি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়।

এই সকল দেশের অর্থনীতিতে ব্যক্তিগত মালিকানাধীন পুঁজিবাদী ক্ষেত্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মধ্যবর্তী ও ছোট পুঁজিপতিদের নিয়ে গঠিত জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী প্রধানত কৃষি ও ব্যবসায়ে এবং অংশত হালকা ব্যবসায়ে ও খাদ্য উৎপাদন ব্যবস্থায় নিযুক্ত থাকে। ব্যক্তিগত মালিকানাধীন ক্ষেত্রকে অবলুপ্ত করার চিন্তা দূরের কথা, নববিকাশমান দেশগুলির শাসকসম্প্রদায় ব্যক্তিগত মালিকানাধীন ক্ষেত্রকে প্রশস্ত কর্মক্ষেত্রের সুযোগ দেয়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই এই শর্ত আরোপ হয় যে, এই ক্ষেত্র রাষ্ট্রের সঙ্গে সহযোগিতা করবে এবং তার অর্থনৈতিক বিকাশে সাহায্য করবে। বিপুল সংখ্যক ছোট কৃষি খামার ও কুটিরশিল্প বর্তমানে বাস্তববিচারে এটা মেনে নিতেই হবে যে, ব্যক্তিগত পুঁজিকে সুযোগ দিতে হবে এবং জাতির স্বার্থে তাকে কাজে লাগাতে হবে।

নববিকাশমান দেশগুলির বর্তমান অর্থনৈতিক জীবনে ক্ষুদ্র পণ্য উৎপাদন ব্যবস্থাই প্রধান ভূমিকা এবং কিছুটা পরিমাণে প্রাকৃতিক অর্থনীতির ক্ষেত্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে, কারণ জাতীয় আয়ের বৃহদংশই এই দুটি ক্ষেত্র থেকে সংগৃহীত হয়।

বিকাশমান দেশগুলি থেকে বিভিন্ন ক্ষেত্রের উৎপাদনের নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যান পাওয়া না গেলেও এটা স্পষ্ট যে, তাদের অর্থনীতি কয়েকটি পৃথক পৃথক ক্ষেত্রের সমাহার। এই প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেরই এমন এক একটি নিজস্ব ধারা আছে যা দেশকে হয় নতুন অধনতান্ত্রিক ও সমাজবাদী নয়তো পুরনো ধনতান্ত্রিক বিকাশের পথে পরিচালিত করতে পারে।

নতুন আফ্রিকান রাষ্ট্রগুলিতে বিকশিত ধনতন্ত্রের অস্তিত্ব নেই বলেই

যে তাদের সামনে ধনতান্ত্রিক প্রভাবমুক্ত সমাজবাদী বিকাশের লক্ষে প্রবাহিত একটিমাত্র পথ খোলা আছে, একথা মনে করার কোন কারণ নেই।

শুধু ব্যবসায়ে ও ক্ষুদ্র শিল্পের ক্ষেত্রেই নয়, কৃষিব্যবস্থায়ও ধনতান্ত্রিক ব্যক্তিগত মালিকানার সম্পর্ক বর্তমান থাকতে পারে। গোষ্ঠীগত কৃষিতেও কৃষকদের কিছুটা স্তরভেদ থেকেই যায়। গ্রামে যেমন ধনী কৃষকও থাকেন, তেমনি মধ্যবিত্ত কৃষকও থাকবেন। কিন্তু অধিকাংশ কৃষকই দরিদ্র কিংবা অত্যন্ত দরিদ্র। ধনী কৃষকেরা লাঙল, কফি গুঁড়ো করার যন্ত্র, নৌকো, মাছ ধরার সরঞ্জাম ধার দেন, কৃষকেরা হয় অর্থে নয় অন্য বস্তু দিয়ে দাম দেন।

এই সব তথ্য থেকে এটাই প্রমাণ হয় যে, শোষণের দীর্ঘকালীন ইতিহাসে ঔপনিবেশিক শাসন লক্ষণীয় কোন ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি গড়ে তুলতে না পারলেও ব্যবসায় ও ঋণ এবং বড় বাগিচাগুলির মাধ্যমে আফ্রিকান দেশগুলির মধ্যে উৎপাদনের সম্পর্কসমূহে ধনতান্ত্রিক স্তরবৈষম্যের অনেক লক্ষণ নিয়ে এসেছে। এর ফলে দেখা যাচ্ছে যে নতুন জাতীয় রাষ্ট্রগুলিতে নানা ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার চিহ্ন বর্তমান, এবং কোন একটি শ্রেণী বা সামাজিক স্তর এক একটি ব্যবস্থার প্রতিভূ। আধুনিক আফ্রিকান সমাজ, অনেকদিন থেকেই, আর শ্রেণীহীন নয়। জনসাধারণের বিপুল বৃহদংশই কৃষক, এঁরাও নানা সমাজিক গোষ্ঠীতে বিভক্ত, অবশ্য দরিদ্রতম অংশই স্বভাবতই সংখ্যাগরিষ্ঠ। শহরের পাতিবুর্জোয়া কারিগর ও ছোট দোকানদারশ্রেণীও গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করে। শোষকশ্রেণী বলতে বোঝায় প্রধানত জমিদার, বিদেশী পুঁজিপতি ও একচেটিয়া ব্যবসায়ীশ্রেণী। শ্রমিকশ্রেণী জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর আগেই (বিদেশী পুঁজিপতিদের বাগিচায় ও খনিতে) আবির্ভূত হলেও সংখ্যালঘু। ১৯৬২ সালের শুরুতে

সমগ্র আফ্রিকায় প্রায় ১৫০ লক্ষ বেতনভোগী শ্রমিককে কাজ করতে দেখা যায়। এঁদের মধ্যে প্রায় ৩,০০০,০০০ জন ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনে সংগঠিত।

আফ্রিকান শ্রমিকশ্রেণী বেশি দিনের পুরনো নয় এবং এখনও ছোট ছোট প্রতিষ্ঠানে ছড়ানো। এঁদের মধ্যে অধিকাংশই মরসুমী শ্রমিক, এঁরা এখনও কৃষি থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হতে পারেন নি। উপজাতীয় ও ও জ্ঞাতিগোষ্ঠীগত সম্পর্কও এঁদের গ্রামাঞ্চলের সঙ্গে বেঁধে রাখে। এইটিই একই সঙ্গে আফ্রিকান শ্রমিকশ্রেণীর দুর্বলতা ও শক্তিস্থল। ট্রেড ইউনিয়নে সংহত স্থায়ী ও সুপ্রতিষ্ঠ কর্মীসংঘের অভাবেই এঁদের দুর্বলতা ; গ্রামাঞ্চলের সঙ্গে, কৃষকসমাজের সঙ্গে অটুট বন্ধনেই এঁদের শক্তি ; কারখানায় শেখা তাঁদের বৈপ্লবিক চিন্তাভাবনা এবং শোষকদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ও নতুন রাষ্ট্রীয় শিল্পের সংগঠনে তাঁদের অভিজ্ঞতা তাঁরা কৃষকদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে পারেন। ভৌগোলিকভাবে শ্রমিকশ্রেণী অত্যন্ত অসমভাবে ছড়ানো। মধ্য, পূর্ব ও পশ্চিম আফ্রিকায় অধিকাংশ নতুন রাষ্ট্রগুলিই অবস্থিত, অথচ এই অঞ্চলে লাভজনক কর্মে নিযুক্ত জনমণ্ডলীর মধ্যে শ্রমিকশ্রেণী মাত্র শতকরা ২ বা ৫ ভাগ।

যেখানেই খনি শিল্প ও বাগিচার অর্থনীতি প্রসার লাভ করছে (দক্ষিণ আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র, দক্ষিণ রোডেশিয়া, কেনিয়া), সেখানেই বেতনভোগী শ্রমিকশ্রেণীর সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটছে। যেসব দেশে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্র দ্রুতগতিতে বিকাশ লাভ করছে (ঘানা, গিনি,) সেখানেও এই শ্রমিকশ্রেণীর সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটছে।

উদাহরণত, ঘানা, গিনি, কেনিয়া ও টাঙ্গানিয়াকায় শ্রমিক -কর্মচারীরা লাভজনক কর্মে নিযুক্ত জনমণ্ডলীর শতকরা ১৮ ভাগ বা প্রায় এক-পঞ্চমাংশ।

প্রাক্তন উপনিবেশগুলির পক্ষে ধনতান্ত্রিক পর্বের মধ্য দিয়ে না

গিয়েও বিকাশ লাভ কীভাবে সম্ভব, বিচার করে দেখা যাক। জনসাধারণের অধিকাংশই এই সব দেশে ঔপনিবেশিক নিষ্পেষণ ও কষ্টভোগের স্মৃতিহেতুই পুঁজিবাদের প্রতি তীব্র ঘৃণা পোষণ করেন। কিন্তু আমরা জানি যে শুধু এইটুকুই যথেষ্ট নয়। এছাড়াও অর্থনৈতিক অবশ্য পূরণীয় কিছু ব্যাপার আছে। এই সব শর্তগুলি অধনতান্ত্রিক বিকাশের পথে চলমান প্রতিটি দেশেই অল্পবিস্তর পূরণ হয়। বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার নিঃস্বার্থ সর্বজনীন সহযোগিতাও দেশবিশেষে বাস্তব পরিস্থিতির উপাদানের অভাব পুষিয়ে দিতে পারে।

প্রতিটি দেশে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা যেমন বিকশিত শিল্পব্যবস্থা ও সংগঠিত শ্রমিকশ্রেণীর অস্তিত্বের উপর নির্ভর করে, ঠিক তেমনিই আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অধনতান্ত্রিক পন্থায় বিশ্বাসী দেশগুলি সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর উন্নত দেশগুলির শক্তিশালী শিল্পব্যবস্থা ও শ্রমিকশ্রেণীর সাহায্য গ্রহণ করতে পারে। সমাজবাদী দেশগুলিতে শিল্প অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে থাকে, সমগ্র উৎপাদনের শতকরা প্রায় ৭৫ ভাগই শিল্পের দান। ১৯৬৩ সালে বিশ্ব সমাজবাদী গোষ্ঠী পৃথিবীর সমগ্র শিল্পোৎপাদনের শতকরা ৩৮ ভাগ উৎপাদন করে। অধিকাংশ সমাজ-বাদী দেশে ভারী যন্ত্রশিল্প, এবং অর্থনীতির সকল শাখার জন্যই যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম নির্মাণ সমগ্র শিল্পোৎপাদনের শতকরা ৫০ ভাগ জুড়ে থাকে।

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির বিপুল সংখ্যক দক্ষ শ্রমিক, প্রয়োগবিদ, ও ইঞ্জিনীয়ার বিকাশমান দেশগুলির শ্রমিকশ্রেণীকে শিক্ষিত করে তুলতে পারেন।

যে-কোন রাষ্ট্রই সুসংবদ্ধ প্রয়াসে অতি উন্নত সমাজবাদী দেশগুলির সহায়তায় ধনতান্ত্রিক বিকাশের পর্বের মধ্য দিয়ে না গিয়েই ক্রমে ক্রমে সমাজবাদে পৌছতে পারেন।

ফলে পূর্বতন উপনিবেশ ও আধা-উপনিবেশগুলির ক্ষেত্রে ধনতান্ত্রিক

কিংবা সমাজবাদী ধারায় বিকাশের সম্ভাবনা থেকে যাচ্ছে। সরকারের অর্থনৈতিক চিন্তাধারার উপরই এই পন্থা নির্বাচন নির্ভর করে। সরকার যদি জনতার গভীরতম আকাঙ্ক্ষার প্রকাশের বাহন হয়, তবে দেশ সমাজবাদ নির্মাণের পথ গ্রহণ করবে। মনে রাখা উচিত যে এই জনতার অন্তর্গত আছেন কৃষকেরা, ছোট উৎপাদনকারীরা, এবং ক্রমশ প্রসারমাণ এক শ্রমিকশ্রেণী—এই শ্রমিকশ্রেণী ক্রমশই অবিচলিতভাবেই শক্তি সংগ্রহ করে চলেছে। যথার্থ স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণে শ্রমিক ও কৃষকের ঐক্য একটি গুরুত্বপূর্ণ শক্তি। এই সংহতিই সম্মিলিত জাতীয় ফ্রণ্টের ভিত্তিভূমি। এই ফ্রণ্ট অধিকতর ও আরো দূরপ্রসারী গণতান্ত্রিক সংস্কারের জন্য সংগ্রাম করবে। অনেক দিক থেকেই প্রতিটি দেশের অভ্যন্তরে ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শ্রমিক ও কৃষকের এই সংহতির দৃঢ়তার উপরেই নতুন সমাজবাদী সমাজের সার্থক রূপায়ণ নির্ভর করে।

রাজনৈতিক স্বাধীনতা প্রাপ্তি এবং অধনতান্ত্রিক বিকাশের পথে দেশকে চালনা করতে স্থিরসঙ্কল্প ও সমর্থ সরকার গঠনের সঙ্গে সঙ্গেই কার্যত পরিবর্তনের কাল শুরু হয়ে যায়। সামন্ততন্ত্র কিংবা আরো পশ্চাৎপদ কোন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা থেকে সমাজবাদে বিবর্তনের কালের সমাজ জাতীয় গণতন্ত্রের রূপ নেয়।

সমাজবাদ নির্মাণের এই কাল কতদিন স্থায়ী হয়?

পৃথিবীর প্রথম সমাজবাদী রাষ্ট্র রাশিয়ার এই লক্ষ্যে পৌঁছতে লেগেছিল প্রায় কুড়ি বছর। মনে রাখতে হবে, রাশিয়া পুঁজিবাদী রাষ্ট্রসমূহ দ্বারা সম্পূর্ণ বেষ্টিত ছিল; তদুপরি অভিজ্ঞতা ও অন্যের সাহায্য, দুয়েরই অভাব ছিল। উপরন্তু, ঐ সময়ের মধ্যে সমাজবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, শুধু উন্নত কেন্দ্রীয় অঞ্চলগুলিতেই নয়, বিপ্লবের পূর্বে সামন্ততান্ত্রিক বা আধাসামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতির পরিবেশগত অ-রুশ

প্রজাতন্ত্রগুলিতেও। অপেক্ষাকৃত উন্নত প্রজাতন্ত্রগুলির শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকদের সহায়তায়, সোভিয়েত ইউনিয়নের সমগ্র জনসাধারণ একযোগে সমাজবাদের গৌরবান্বিত লক্ষ্যে পৌঁছাল। পরস্পরের এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের সহযোগিতায় সমাজবাদ নির্মাণরত ইওরোপীয় জনগণতন্ত্রগুলিতে ১০।১২ বছরেই সমাজবাদের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে।

দশটিরও বেশি দেশে সমাজবাদ নির্মাণের অভিজ্ঞতা থেকে কয়েকটি সিদ্ধান্ত টানা যায়। নতুন সমাজ গঠনে কতটা সময় লাগবে, তা অনেকটাই নির্ভর করে উৎপাদিকা শক্তিগুলির বিকাশের স্তরের উপর ; সমাজের সমাজবাদী বিবর্তনের নির্দেশনায় রাজনৈতিক দলসমূহ ও সরকারসমূহ কর্তৃক সঠিক অর্থনৈতিক নীতি গ্রহণের উপর, সমাজবাদী দেশগুলির মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহায়তার গভীরতার উপর ; এবং সমাজবাদ নির্মাণে নিযুক্ত সব দেশগুলির উপকরণসমূহ ও সুযোগসমূহের সঠিক ব্যবহার ও সমন্বয়বিধানের উপর।

বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতায় বিজ্ঞানভিত্তিক সমাজবাদের এই সিদ্ধান্তই সমর্থিত হয়েছে যে, শিল্প, কৃষি ও পরিবহণের উৎপাদিকা শক্তিসমূহের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই নতুন সমাজ নির্মাণের নিয়মবদ্ধ ধাবাবাহিক প্রক্রিয়া চলতে থাকে।

উপরন্তু, অভিজ্ঞতায় আরো প্রমাণিত হয়েছে যে, জনতার গভীরতম স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রেখে প্রতিটি পর্বে গভীরপ্রসারী সংস্কারগুলি করে যেতে পারলে এবং নতুন সমাজের গঠনে জনসাধারণ যদি সচেতনভাবে ও সৃষ্টিশীলভাবে অংশগ্রহণ করে, তবে সমাজবাদ আরো দ্রুত গঠিত হতে পারে।

সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সামাজিক উৎপাদনের লক্ষ্য

কেবলমাত্র রাজনৈতিক মুক্তি ও স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাতেই জন-

সাধারণ অত্যাচারী ও শোষককুলের বিরুদ্ধে উঠে দাঁড়াতে উদ্যোগী হতে পারে না। ঐ মুক্তি এবং ঐ নতুন গণরাষ্ট্র তারা চায় নিজেদের ও সন্তান-সন্ততিদের জন্য উন্নততর এবং আরো সুখী জীবন গড়ার কামনায়, তাদের বস্তুগত ও কৃষ্টিগত চাহিদা পূরণের আশায়।

তাদের গভীরতম স্বার্থ কতটা রক্ষিত হল, তাদের জীবনধারণের মান কতটা উন্নত হল, তারই উপর ভিত্তি করে জনসাধারণ বিপ্লবের ফলাফল ও সমাজতন্ত্রের গুণাগুণ প্রধানত বিচার করে।

মানবজীবনের পক্ষে প্রয়োজন বাস্তব সুযোগসমূহই যে-কোন সমাজের ভিত্তিসম, একথা সকলেই জানেন। কারখানা, জমি, পরিবহণের পন্থাসমূহ, অর্থাৎ উৎপাদনের তাবৎ উপাদান কার অধিকারে এরই উপর কোন সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো নির্ভর করে।

যে-কোন সমাজেই জনস্বার্থরূপেই অর্থনৈতিক সম্পর্কসমূহ প্রধানত প্রকাশ পায়। ব্যক্তিগত মালিকানা এবং এক শ্রেণী কর্তৃক অন্য শ্রেণীকে শোষণের উপর প্রতিষ্ঠিত সমাজব্যবস্থায় শোষক ও শোষিত শ্রেণীর স্বার্থের বিরোধ অমীমাংসেয়, বিপরীত কোটীর বিরোধ। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় পুঁজিপতিরা শ্রমিকদের শোষণ করে, এবং মুনাফাই পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য। এই লক্ষ্য থেকেই শ্রমিকশ্রেণী ও বুর্জোয়াশ্রেণীর স্বার্থের অমীমাংসেয় বৈপরীত্যের প্রকৃতি বোঝা যায়।

সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় শ্রমজীবীশ্রেণী উৎপাদনের উপাদানসমূহ ও তাঁদের পরিশ্রমের সমূহ উৎপাদনের মালিক। মানুষ কর্তৃক মানুষকে শোষণের এই সমাজে কোন স্থান নেই। সেই কারণেই সমাজের সকল সভ্যেরই স্বার্থ একই কেন্দ্রে মিলিত হয় এবং উৎপাদনের সাধারণ লক্ষ্যে প্রকাশিত হয়। এই লক্ষ্য আসলে জনসাধারণের ক্রমবর্ধমান বস্তুগত ও কৃষ্টিগত চাহিদা সম্পূর্ণ পূরণ করা।

সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সামাজিক উৎপাদনের বিকাশে প্রধান ক্রিয়াশক্তি এই যে, সমাজের সকলেই তাঁদের চাহিদার সম্পূর্ণ পূরণ প্রত্যাশা করেন। তাই সমাজবাদের প্রধান অর্থনৈতিক নীতি উৎপাদনের অবিচল বিকাশ ও উন্নতিবিধানের মধ্য দিয়ে সমাজের চাহিদার সম্পূর্ণতম পূরণ।

এইভাবেই উৎপাদনের উপাদানসমূহের সামূহিক মালিকানার উপরেই সমাজবাদের মৌল অর্থনৈতিক বিধান প্রতিষ্ঠিত। জনসাধারণ কোন খেয়ালের বশে এই বিধানকে চালু করতে পারে না, ভাঙতেও পারে না।

বিপ্লবের পরে শ্রমজীবী জনসাধারণ দেশের প্রভু হয়ে ওঠেন, নিজেদের জন্য কাজ করতে শুরু করেন। তখন অর্থনৈতিক বিকাশ তাঁদেরই স্বার্থের অনুকূলে পরিচালিত হওয়া উচিত।

খাদ্য, বস্ত্র, বিদ্যুৎশক্তি, কারখানার যন্ত্র, কাঁচা মাল, মোটর গাড়ি, ট্রেনের কামরা, বাড়িঘর—দেশে যা-ই উৎপন্ন হয়, টাকার হিসেবে সবেরই মূল্য নিরূপিত হয় এবং টাকার এই অঙ্কটিকেই একটি নির্দিষ্ট কালসীমার (সাধারণত এক বছর) মোট সামাজিক উৎপাদন বলে ধরা হয়। এই মোট উৎপাদন থেকে কাঁচা মাল, বিদ্যুৎশক্তি, সহায়ক উপকরণসমূহ ও যন্ত্রপাতির মূল্যহ্রাসের খরচ বাদ দিলেই এক বছরের নতুন উৎপাদনের মোট হিসেব পাওয়া যায়। এই অঙ্কটিকেই জাতীয় আয় বলা হয়। এক বছরের মধ্যে শ্রমিক ও কৃষকের পরিশ্রমের ফলে উৎপন্ন সমুদয় জড় পদার্থের সমাহারই জাতীয় আয়।

বিপ্লবের পরে সামাজিক উৎপাদনের নতুন লক্ষ্যের প্রকৃতি বোঝা যায় জাতীয় আয়ের বণ্টনব্যবস্থা থেকে। উদাহরণত, ১৯১৩ সালে দেখা যায়, বুর্জোয়াশ্রেণী, জমিদারশ্রেণী, ধনী কৃষক এবং অন্য যেসব শ্রেণী অন্য শ্রেণীকে শোষণ করে জীবনধারণ করে, জারতন্ত্রী রাশিয়ায়

তারা ছিল লোকসংখ্যার প্রায় এক-ষষ্ঠাংশ (শতকরা ১৬·৩ ভাগ), কিন্তু তারাই জাতীয় আয়ের প্রায় অর্ধেক (শতকরা ৪৭·২ ভাগ) আত্মসাৎ করত।

অক্টোবর বিপ্লবের দশ বছর পর, জাতীয় আয়ে শোষকশ্রেণীর অংশ শতকরা ৮০ ভাগেরও বেশি হ্রাস পায়, শতকরা ৪৭·২ ভাগ থেকে শতকরা ৮·৬ ভাগে নেমে আসে।

সমাজবাদ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই সমগ্র জাতীয় আয়ই শ্রমজীবী মানুষের হাতে চলে আসে এবং তাঁদেরই স্বার্থে বণ্টন করা হয়। বিপ্লবের পূর্বে জাতীয় আয়ের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ জনসেবার কাজে ব্যয়িত হত। কিন্তু সমাজবাদের বিজয়ের পর জাতীয় আয়ের তিন-চতুর্থাংশ (শতকরা ৭৫ ভাগ) ঐ খাতে ব্যয়িত হয়। এই খাতের নয়-দশমাংশ লোক-সাধারণের ব্যক্তিগত আয়ে (শ্রমিক, কর্মচারী, কৃষকদের আয়রূপে) চলে যায়, এক-দশমাংশ সামাজিক সেবায় ব্যয়িত হয় (বিদ্যালয়, হাসপাতাল, বৃদ্ধদের জন্য বিশ্রামনিবাস, শাসনযন্ত্র, প্রভৃতি চালু রাখার কাজে)।

জাতীয় আয়ের এক-চতুর্থাংশ সঞ্চয়ের খাতে যায়, অর্থাৎ উৎপাদনের প্রসার, নতুন কারখানা নির্মাণ, নতুন শক্তিকেন্দ্র নির্মাণ, সেচ ব্যবস্থা, কৃষির জন্য রাসায়নিক সার উৎপাদন, এবং যন্ত্রপাতি ও ভোগ্য পণ্য আমদানির জন্য ব্যয়িত হয়।

অন্য সমাজবাদী দেশগুলিতেও জাতীয় আয় এইভাবেই বণ্টন করা হয়।

সমাজবাদী উৎপাদনের মূল লক্ষ্য জনসাধারণের বস্তুগত ও কৃষ্টিগত চাহিদার সর্বাধিক সম্ভবপর পূরণ আরো কয়েকটি লক্ষণ থেকে দেখানো যায়—যেমন, শ্রমিকদের উৎপাদন ক্ষমতার বৃদ্ধির সঙ্গে জনসাধারণের আসল আয়ের বৃদ্ধির স্পষ্ট আনুপাতিক সম্পর্ক। সমাজবাদী ব্যবস্থায় যেহেতু কোন শোষকের অস্তিত্ব নেই এবং যেহেতু জনসাধারণ নিজেরাই

উৎপাদনের উপাদনসমূহের এবং উৎপন্ন দ্রব্যসমূহেরও মালিক, সেইহেতু শ্রমিকদের উৎপাদনক্ষমতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই আসল আয়ও বৃদ্ধি পেতে বাধ্য।

প্রশ্ন উঠতে পারে: জনসাধারণের চাহিদা মেটানোকেই উৎপাদনের লক্ষ্য বলে স্থির করা হবে কখন? সমাজবাদে উত্তরণের পর? না, সমাজবাদ যখন নির্মিত হচ্ছে, তখনই? এটি এক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, যে মুহূর্তে একটি দেশ সমাজবাদের পথ গ্রহণ করে, সেই মুহূর্তেই অর্থনীতিতে সমাজবাদী ব্যবস্থার উদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই সামাজিক উৎপাদনের নতুন লক্ষ্যও স্থির হয়ে যায়। সমাজবাদী ব্যবস্থা যতই সুপ্রতিষ্ঠ হয়, শ্রমিকদের উৎপাদনক্ষমতার উপর জনসাধারণের আসল আয়ের নির্ভরতা ততই স্পষ্টভাবে ধরা পড়তে থাকে।

১৯১৩ থেকে ১৯৬৩, এই দীর্ঘকালের মধ্যে সোভিয়েতের শিল্পব্যবস্থায় শ্রমিকদের উৎপাদনক্ষমতা শতকরা ১২০০ ভাগেরও বেশি বৃদ্ধি পায় এবং শ্রমিকদের আসল আয় শতকরা ৪৯০ ভাগ বৃদ্ধি পায়, কিন্তু ১৯৪০ থেকে ১৯৬০-এর মধ্যে এই ফারাক আরো কমে আসতে থাকে। উৎপাদনক্ষমতায় প্রতি শতকরা ১০ ভাগ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিল্পক্ষেত্রে, অফিসে বা অন্যত্র কর্মরত শ্রমিকদের আসল আয় প্রায় শতকরা ৬-৭ ভাগ বাড়তে থাকে। সমাজবাদ প্রতিষ্ঠার পরেই নতুন সমাজবাদী ব্যবস্থার সুফলসমূহ পূর্ণতর আকারে লাভ করা যায়। কিন্তু উত্তরণের পর্বেও জনসাধারণের স্বার্থে উৎপাদনের বিকাশ ঘটে। সমাজবাদের নির্মাণ ও প্রতিষ্ঠার এইটিই মূল গ্যারান্টি।

জনসাধারণের আসল আয়ের তুলনায় শ্রমিকদের উৎপাদনক্ষমতা দ্রুততর হারে বৃদ্ধি পাওয়া উচিত, অন্যথায় সমাজ সঞ্চিত সম্পদ ও উৎপাদনের প্রসারের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে। কিন্তু এই দুইয়ের

বৃদ্ধির মধ্যে ফারাক খুব বেশি হওয়া উচিত নয়। অর্থনৈতিক বিকাশ যেখানে পরিকল্পনাধীন, সেখানে জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি ঘটলেই তার একাংশ সঞ্চয়ের খাতে যায়, অন্য অংশ ব্যক্তিগত আয়ের খাতে যুক্ত হয়। এই ব্যবস্থার গুরুত্ব কোন বিশেষ সমাজের কাঠামোয় সীমিত নয়। কারখানায় কর্মরত প্রত্যেকটি শ্রমিক যেন জানতে পারেন যে, শ্রমিকদের উৎপাদনক্ষমতা ও সমগ্র উৎপাদন বৃদ্ধি পেলেই এই বৃদ্ধির নির্দিষ্ট একাংশ তাঁর জীবনধারণের মানোন্নয়নে নিয়োজিত হবে।

শ্রমিকদের উৎপাদনক্ষমতা ও আসল আয়ের বৃদ্ধির দীর্ঘকালীন সঠিক আনুপাতিক হারের সঙ্গে যুক্ত থাকে অর্থনৈতিক বিচারে নির্ভরযোগ্য এমন এক অনুপাত রক্ষার তাগিদ যাতে স্বল্পকালীন পর্বেও শ্রমিকদের উৎপাদনক্ষমতা ও সামগ্রিক উৎপাদন বৃদ্ধির দিকে তাগিদ থাকে। এই তাগিদ না থাকলে কুফল সহজেই ধরা পড়ে; উৎপাদকেরা উৎপাদনের প্রসার ও শ্রমিকদের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির দিকে নজর দিতে উৎসাহ বোধ করেন না।

সমাজতন্ত্রে জনসাধারণের আসল আয় শ্রমিকদের উৎপাদনক্ষমতার সঙ্গে সঙ্গেই বাড়তে থাকে। এরই ফলে সমগ্র শ্রমজীবী জনসাধারণ উৎপাদনক্ষমতা বৃদ্ধির অর্থনৈতিক ভিত্তি এবং বাস্তব উদ্দীপক লাভ করে। সমাজবাদের মৌল অর্থনৈতিক বিধির এইটেই আসল কথা, এবং এতেই নতুন সমাজব্যবস্থার মৌল সুযোগসুবিধার আভাস পাওয়া যায়।

জনসাধারণের মৌল স্বার্থ রক্ষায় নিয়োজিত বলেই সমাজবাদের মৌল অর্থনৈতিক বিধি ব্যক্তিবিশেষ বা লোকসাধারণের অংশবিশেষের ভোগ্যপণ্যের চাহিদা মেটানোর চেষ্টায় আবদ্ধ না থেকে উৎপাদনের বিকাশ, প্রসার ও উন্নতিবিধানে সচেষ্ট হয়।

উৎপাদনের প্রসার ও উন্নতিসাধনের নিয়ত চেষ্টার মধ্য দিয়ে জন-

সাধারণের চাহিদা পূরণের পূর্ণতর সুযোগ রচনা কোন ব্যক্তিবিশেষের ইচ্ছাপূরণের ফলশ্রুতি নয়, সমাজবাদী ব্যবস্থার চরিত্র থেকেই উদ্ভূত একটি বাস্তব ও বিধিসম্মত প্রক্রিয়া। সমাজবাদী উৎপাদনব্যবস্থার বিকাশ ঘটতে পারে, উৎপাদকদের স্বার্থের দিকে নজর রাখলেই। অন্যথায় উৎপাদনের প্রসার ও উন্নতি ঘটাতে উৎপাদকেরা কোন উৎসাহই অনুভব করবেন না। কেবল সমাজবাদের প্রতিষ্ঠা বা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সাম্যবাদের জয়যাত্রার পরে নয়, তার আগেই জনসাধারণ যখন তাঁদের বিকাশের পথ বেছে নিয়েছেন, তখনই জনসাধারণের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখেই উৎপাদনের বিকাশ ঘটবে। যে-সব দেশ ধনতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রের দিকে এগোচ্ছে, এবং যে-সব দেশ সামন্ততন্ত্র ও ঔপনিবেশিক দাসত্ব থেকে সমাজতন্ত্রের দিকে এগোচ্ছে, উভয় ক্ষেত্রেই এই একই নীতি গ্রাহ্য।

অধনতান্ত্রিক পথে অগ্রসর হতে গেলে জনসাধারণের স্বার্থে অর্থনীতির পুনর্গঠন নতুন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মুহূর্তেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জনসাধারণের স্বার্থ যদি না বিবেচনা করা হয়, তাঁদের জীবননির্বাহের মানের উন্নতিকল্পে যদি কিছুই না করা হয়, তবে তাঁদের কর্মশক্তি ক্রমশঃ শিথিল হয়ে পড়বে।

বিপ্লবের পর কোন্ উদ্দেশ্যের দ্বারা উৎপাদনব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত হয়, তাতেই নতুন রাষ্ট্রের প্রকৃতি ও কর্মপন্থা বিবেচিত হবে—একথা নিশ্চয়ই বলা যায়।

জনসাধারণের নেতৃত্বে সম্পন্ন বিপ্লবের (ঔপনিবেশিকতা-বিরোধী সংগ্রামসহ) চূড়ান্ত জয় নিশ্চিত করতে গেলে শ্রমজীবী মানুষের কাছে তাঁদের সংগ্রামের ফলসমূহ তুলে ধরতে হবে। উৎপাদনের বিকাশ ও শ্রমিকদের উৎপাদনীক্ষমতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জীবননির্বাহের মান ক্রমশ উন্নত করে তুলতে হবে। এতেই জনসাধারণের মধ্যে নতুন সমাজ

রচনার কাজে উৎসাহ আসে, তাঁদের কর্মপ্রয়াস দ্বিগুণ হয়ে ওঠে। এই-ভাবেই সামাজিক উৎপাদনের নতুন লক্ষ্য জনস্বার্থে অর্থনীতির উন্নয়ন কেবল সমাজবাদ প্রতিষ্ঠার পরেই নয়, তার আগেও সকল প্রকৃত গণতান্ত্রিক বিপ্লব ও অধনতান্ত্রিক বিকাশের পথে অগ্রসর গণসরকারের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত পরিবেশেও কর্মঠ চালিকা শক্তি হয়ে দাঁড়ায়।

৪। সমাজতন্ত্রের বস্তুগত ও প্রয়োগগত ভিত্তি

যে-কোন রাজনৈতিক ব্যবস্থার পরিবেশেই খাদ্য, বস্ত্র ও অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় উপকরণসমূহের উৎপাদনের উপরেই সমাজের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। পূর্ববর্তী কোন সমাজব্যবস্থার তুলনায় পরবর্তী যে-কোন সমাজব্যবস্থার অগ্রগতির প্রমাণ মেলে তখনই, যখন এই নতুন সমাজব্যবস্থা দ্রব্যাদির উৎপাদনের বিকাশ ও জীবননির্বাহের মানোন্নয়নের অধিকতর সুযোগ রচনা করতে পারে। নতুন সমাজব্যবস্থা যখন উৎপাদিকা শক্তিগুলিকে বিকাশের উন্নততর স্তরে পৌছতে সাহায্য করে, তখনই পূর্ববর্তী সমাজব্যবস্থার স্থলে নতুন সমাজব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা প্রগতিধর্মী বলে চিহ্নিত হয়, ও তার স্থায়িত্ব সম্পর্কে আস্থা রাখা যায়। এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, কী দ্রব্য উৎপাদন হচ্ছে তাতে নয়, বরং কীভাবে উৎপাদন চলছে, তাতেই এক সমাজব্যবস্থা থেকে অন্য সমাজব্যবস্থার পার্থক্য ধরা পড়ে। উদাহরণত বলা যায়, সুতো কঠিন কায়িক শ্রমের দ্বারা উৎপন্ন হতে পারে। কিন্তু সেই একই সুতো যন্ত্রে উৎপন্ন হতে পারে, শোধিত হতে পারে। উৎপাদনের এই বিশিষ্ট রূপ সমাজের বস্তুগত ও প্রয়োজনগত ভিত্তির মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়।

প্রয়োগগত যে-সকল পন্থার মধ্য দিয়ে মানুষ তার প্রয়োজনীয় দ্রব্যসমূহ উৎপাদন করে, সেই সব পন্থা নিয়েই এই বস্তুগত ও

প্রয়োগগত ভিত্তি। ধনতন্ত্রের উদয়ের আগে উৎপাদন কার্যে ব্যবহৃত শক্তির প্রধান উৎস ছিল মানুষের পেশীবল, ঘোষ, ঘোড়া, প্রভৃতি পশু এবং জল (সেচব্যবস্থা, জলকল প্রভৃতি)। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উৎপাদিকা শক্তিসমূহের দ্রুত বিকাশ ঘটল এবং বাষ্পশক্তির প্রয়োগে সমাজে শ্রমশক্তির উৎপাদনী ক্ষমতার বৃদ্ধি ঘটল। বাষ্পযন্ত্রের ব্যবহারে উৎপাদন যন্ত্রভিত্তিক হল, এবং বিপুল প্রসারিত যন্ত্রশিল্প ধনতন্ত্রের বস্তুগত ও প্রয়োগগত ভিত্তি হয়ে দাঁড়াল।

কিন্তু ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যন্ত্রের প্রয়োগ অর্থনীতির সব শাখায় ছড়িয়ে পড়ে না। বৃহদায়তন শিল্পে যন্ত্রের প্রয়োগ সাধারণত উচ্চ মানে পৌঁছলেও শিল্পব্যবস্থার অনেক ক্ষেত্রেই শ্রমের ব্যবহার প্রধানত কায়িক থেকে যায় এবং যন্ত্রের সামান্যই প্রয়োগ ঘটে। উদাহরণস্বরূপ বৃটেন এবং অন্য কোন কোন দেশের কয়লাশিল্পের উল্লেখ করা যায়। যন্ত্রায়নের এই অসম বিকাশের একটি কারণ নির্দেশ করা যায়। কায়িক পরিশ্রমের স্থলে যন্ত্র প্রবর্তন করলে আরো বেশি মুনাফার সুযোগ থাকবে, কেবলমাত্র এমন ক্ষেত্রেই পুঁজপতিরা নতুন যন্ত্রপাতি বসিয়ে থাকেন। শ্রমিকদের সংখ্যা যেখানে বেশি, শ্রমিকদের বেতন যেখানে কম, সেখানে পুঁজিপতিরা নতুন যন্ত্র বসাবার চেয়ে আরো বেশি শ্রমিককে কাজে লাগানোই বেশি লাভজনক মনে করেন। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কৃষির ক্ষেত্রেই যন্ত্রের ব্যবহার সবচেয়ে কম, কারণ সবচেয়ে উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলিতেও এখনও এই ক্ষেত্রে কৃষকদের আয়ত্তে অসংখ্য ছোট ছোট জমি রয়ে গেছে, এই সব ছোট জমিতে যন্ত্রের ব্যবহারে খরচও যেমন বেশি পড়ে, তেমনি লাভের অংশেও কম পড়ে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত অত্যুন্নত দেশেও শতকরা ৪০ ভাগ কৃষিজীবীর ট্র্যাক্টর নেই। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কৃষিক্ষেত্রে যন্ত্র ব্যবহারের বিস্তার অত্যন্ত অসম রয়ে গেছে। উদাহরণত,

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি ৪১ হেক্টেয়ার চাষজমিতে একটি ট্র্যাক্টর, ফ্রান্সে প্রতি ৫০ হেক্টেয়ারে, স্পেনে প্রতি ৬৫০ হেক্টেয়ারে, আফ্রিকায় গড়ে প্রতি ১৩০০ হেক্টেয়ারে এবং ভারতে প্রতি ৮,৫৮৪ হেক্টেয়ারে।

সবদিক বিচার করলে অবশ্য মানতে হয় যে সামন্ততন্ত্রের তুলনায় ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা গুণগতভাবে উন্নত বস্তুগত ও প্রয়োগগত এক ভিত্তি রচনা করেছে এবং শ্রমিকসমাজের উৎপাদনীক্ষমতার বিপুল বৃদ্ধির জোরেই সামন্ততন্ত্রকে পরাস্ত করেছে। ধনতন্ত্রকে পরাস্ত করতে গেলে, সমাজতন্ত্রকে আরো উন্নত বস্তুগত ও প্রয়োগগত ভিত্তি রচনা করতে হবে। এরই ফলে জনসাধারণ আরো বেশি পরিমাণে জীবনের বস্তুগত সম্পদ ভোগ করতে পারেন; বুর্জোয়া শাসনকালের তাঁদের জীবন সহজতর ও সমৃদ্ধতর হয়।

খালি হাতে ধনতন্ত্রকে পরাভূত করা যায় না। জনসাধারণ শুধু রাজনৈতিক ক্ষমতা ছিনিয়ে নিলেই চলবে না; অর্থনীতিকে এমন ভাবে সাজাতে হবে যাতে আরো বেশি পরিমাণে আরো উন্নত মানের দ্রব্যসমূহ ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার তুলনায় অল্প ব্যয়ে উৎপন্ন হতে পারে। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মূল লক্ষ্যে পৌছবার একমাত্র পথ এমন এক যন্ত্র নির্মাণ শিল্পের প্রতিষ্ঠা যাতে কৃষিসহ অর্থনীতির সমূহ শাখা পুনর্গঠিত হতে পারে। অতএব, কেবল শিল্পক্ষেত্রে নয়, কৃষি, গৃহনির্মাণ এবং অর্থনীতির সমস্ত শাখায় বিপুল হারে যন্ত্র উৎপাদনই সমাজতন্ত্রের বস্তুগত ও প্রয়োগগত ভিত্তি হতে পারে।

ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার অভ্যন্তরেই সমাজতন্ত্রের অন্যতম বস্তুগত ও প্রয়োগগত ভিত্তি শিল্পক্ষেত্রে বিপুল হারে যন্ত্র উৎপাদনের কাজ শুরু হয়ে যায়। কিন্তু বিপ্লবের পর সমাজবাদী শিল্পায়নের মধ্য দিয়েই এই ভিত্তি পূর্ণাঙ্গরূপে রচিত হয়।

যেহেতু সমাজতন্ত্রের বস্তুগত ও প্রয়োগগত ভিত্তি রচনা অর্থনীতির

সকল শাখায় প্রয়োগগত ভিত্তির রূপান্তরের সঙ্গে জড়িত, সেইহেতু ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্প শিল্পায়নে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের দৃষ্টান্ত থেকে এই ব্যাপারটির প্রমাণ দেওয়া যায়। বিপ্লবের আগে রাশিয়া ছিল এক কৃষিপ্রধান দেশ; এখানে শিল্পব্যবস্থা তখনও বিকাশ লাভ করে নি। দেশের সমগ্র উৎপাদনের শতকরা, ৪২'১ ভাগ তখন শিল্পজাত, সমগ্র শিল্পোৎপাদনের আবার শতকরা ৩৩'৩ ভাগ ভারী শিল্পের দান, ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পের দান শতকরা ৬'৮ ভাগ। ১৯৪০-এ শিল্পোৎপাদনের শতকরা ৬৭০ ভাগ বৃদ্ধি পায়, ১৯৬২ সালে ১৯১৩ সালের তুলনায় শতকরা ৪,৭০০ ভাগ বৃদ্ধি পায়। ১৯৪০-এ ভারী শিল্প পরিসরে ১৩ গুণ বৃদ্ধি পায়, শিল্পোৎপাদনে ভারী শিল্পের অংশ ১৯৪০-এ শতকরা ৬১.২ ভাগ ও ১৯৬৩ সালে শতকরা ৭৪'৫ ভাগ দাঁড়ায়। ইঞ্জিনীয়ারিং ও যন্ত্র নির্মাণ শিল্পের ক্ষেত্রেই বিকাশের হার বিশেষ দ্রুত দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় ধাতু কাটার লেদ মেশিনের উৎপাদন ১৯১৩ সালে ১৮০০০ থেকে বেড়ে ১৯৪০ সালে ৫৮০০০ এবং ১৯৬৩ সালে ১৮৩০০০ দাঁড়ায়। সোভিয়েত ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্প এখন দেশের প্রয়োজনীয় সর্বপ্রকার যন্ত্রপাতি ও উপকরণ নির্মাণে সমর্থ।

১৯১৩ সালে মাথাপিছু প্রত্যেক কৃষিজীবী মাত্র ০'৫ অশ্বশক্তি পরিমাণ যন্ত্রশক্তির সহায়তা লাভ করতেন। ১৯২৯ সালে যখন ব্যাপকভাবে যৌথ খামার পত্তন শুরু হয়, তখনও 'যন্ত্রায়নের' এই হার অপরিবর্তিত ছিল। কৃষক পিছু ঐ অর্ধ অশ্বশক্তি পরিমাণ শক্তি নিয়েই কৃষকেরা একজোট হয়ে যৌথ খামার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

অন্তর্লীন দহনক্ষমতাসম্পন্ন এঞ্জিনসমূহই (প্রধানত ট্র্যাক্টর) কৃষির ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের যান্ত্রিক ভিত্তি রচনা করে। যন্ত্রের প্রথম প্রয়োগ ঘটে সরাসরি মাঠের কাজেই, প্রধানত খাদ্যশস্যের চাষে এবং

সুতো, বীট এবং অন্যান্য শিল্পে প্রয়োজনীয় কৃষিজাত দ্রব্যের চাষে। ১৯৬১ সালে যৌথ খামার ও রাষ্ট্রীয় খামারে (সমগ্র উৎপাদনকর্মের পরিমাণের অনুপাতে) যন্ত্রের প্রয়োগ ঘটে নিম্নোক্ত হারে : জশার ছাড়া খাদ্যশস্যের ফসল-কাটায় শতকরা ৯৬ ভাগ ; শস্যের ভূসি ছাড়ানোর কাজে শতকরা ৯০ ভাগ , সূর্যমুখীর ফসল-কাটায় শতকরা ৯৯ ভাগ , বীটের ফসল-কাটায় শতকরা ৬২ ভাগ। প্রাক্-বিপ্লব কালের সঙ্গে তুলনায় প্রতি হেকটেয়ার শস্যের জমিতে কৃষকের পরিশ্রমের পরিমাণ শতকরা ৯১·৭ ভাগ কমে গেছে, যৌথ খামারেও এই পরিমাণ শতকরা ৬৭ ভাগেরও বেশি কমে গেছে। সোভিয়েত আমলে কৃষিব্যবস্থায় যন্ত্রের ব্যবহার শতকরা প্রায় ৯০০ ভাগ বেড়ে গেছে। ১৯৬১ সালে সোভিয়েত কৃষিব্যবস্থায় মাথাপিছু প্রত্যেক কৃষক ৫·৫ অশ্বশক্তি পরিমাণ যন্ত্রশক্তি ব্যবহার করতে পেরেছেন। এই মোট ১৬৪,০০০,০০০ অশ্বশক্তি পরিমাণ শক্তির মধ্যে শতকরা ৯৬ ভাগই নানা এঞ্জিনের ব্যবহার ; বিপ্লবের আগের পর্বে যে ২৮,৯০০,০০০ অশ্বশক্তি পরিমাণ শক্তি পাওয়া যেত, তার শতকরা এক ভাগেরও কম আসত এঞ্জিনের ব্যবহার থেকে।

সারা বছর ধরে খাটতে হত এমন ২ কোটি কৃষক ট্র্যাক্টরের ব্যবহার শুরু হতেই কৃষিকাজ থেকে মুক্তি পেয়েছেন। প্রাক্-বিপ্লব যুগের সঙ্গে তুলনায় কৃষির ক্ষেত্রে কৃষকদের উৎপাদনক্ষমতা সামগ্রিকভাবে শতকরা ৪০০ ভাগেরও বেশি বৃদ্ধি পায়। ফলে কর্মরত কৃষকদের সংখ্যা শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ কমে গেল, অথচ উৎপাদকের পরিমাণ দ্বিগুণ হল। বিপ্লবের আগে একজন কৃষক দু'জন বা তিন জনের মত খাদ্য উৎপাদন করতেন ; অথচ বর্তমানে কোন যৌথ বা রাষ্ট্রীয় খামারের একজন কৃষক সাত জনেরও বেশি লোকের মত খাদ্য উৎপাদন করেন।

সমাজতন্ত্রের বস্তুগত ও প্রয়োগগত ভিত্তি রচনার সঙ্গে সঙ্গেই দেশে

অর্থনৈতিক কাঠামো এবং অর্থনীতির বিভিন্ন শাখায় জনসংখ্যার আনুপাতিক যোগদানের অঙ্কও বদলে যায়। ১৯১৩ সালে বেতনজীবী সম্প্রদায়ের শতকরা মাত্র ৯ জন শিল্প ও নির্মাণকর্মের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কিন্তু ১৯৬২ সালে এই দুই শাখায় শ্রমিকশ্রেণীর শতকরা ৩৪ জন মাত্র নিযুক্ত ছিলেন; কৃষিকার্যে নিযুক্ত শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের অনুপাত শতকরা ৭৫ জন থেকে ৩৫ জনে নেমে আসে।

বিদ্যুৎশক্তি সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদ উভয়েরই বস্তুগত ও প্রয়োগগত ভিত্তি রচনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, কারণ আধুনিক বৃহদায়তন শিল্পে বিদ্যুৎশক্তিই শক্তির প্রধানতম উৎস, অর্থনীতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শাখাগুলির মধ্যে অনেকগুলিই কেবলমাত্র বিদ্যুৎশক্তি ব্যবহার করেই বিকাশলাভ করতে পারে।

বাষ্পশক্তির সুবিধা ব্যবহার করে ধনতন্ত্র বিকাশলাভ করেছিল, এবং সেই বিকাশের যুগ বাষ্পশক্তির যুগ বলেই পরিচিত হয়েছিল। কিন্তু উৎপাদনব্যবস্থার নতুন পরিণততর ধারা সমাজতন্ত্র বিদ্যুৎশক্তির প্রয়োগের উপর প্রতিষ্ঠিত, এবং এই যুগ বিদ্যুৎশক্তির যুগ। সেই কারণেই সমগ্র অর্থনীতির প্রয়োগগত নববিন্যাসে বৈদ্যুতীকরণের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে বিদ্যুৎশক্তির উৎপাদন ১৯১৩ সালে ২·০ কোটি কিলোওয়াট (ঘণ্টায়) থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৪০-এ ৪৮০০ কোটি পরে ১৯৬৩ সালে ৪১২০০ কোটি কিলোওয়াটে (ঘণ্টায়) গিয়ে পৌঁছোয়।

সমাজতন্ত্রের পথে অগ্রসরমাণ সকল দেশই দ্রুত শিল্পায়ন চালিয়ে যাচ্ছে। অতীতে কৃষিনির্ভর বা শিল্প-কৃষিনির্ভর দেশগুলিতে শিল্প দ্রুততর গতিতে এগোচ্ছে। উদাহরণত পোল্যাণ্ডে জনপ্রতি উৎপাদিত দ্রব্যের উৎপাদন শতকরা ৯০ ভাগ বেড়ে গেছে। ঐ দেশে বিপ্লবের

আগে ইঞ্জিনীয়ারিং, জাহাজনির্মাণ, রাসায়নিক, গৃহনির্মাণ শিল্পের অস্তিত্বই ছিল না ; এখন এই সব শিল্পও গড়ে উঠেছে। অতীতে শিল্প-ব্যবস্থায় পশ্চাদ্‌পদ রুমেনিয়া, বুলগেরিয়া, প্রভৃতি দেশসমুহ এখন কিছু কিছু যন্ত্রপাতি রপ্তানি পর্যন্ত করে থাকে। হাঙ্গেরির মত অতীতে শিল্প-কৃষিনির্ভর দেশ বর্তমানে সোভিয়েত ইউনিয়নে যা রপ্তানি করে, তার শতকরা ৬০ ভাগই যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য উপকরণ।

বিপ্লবের আগে কোন দেশ শিল্পব্যবস্থার দিক থেকে যতই পশ্চাদ্‌পদ থাকে, সেই দেশে সমাজতন্ত্রের বস্তুগত ও প্রয়োগগত ভিত্তি স্থাপন ততই কঠিন হয়। এই অসুবিধা অবশ্য শুধুই বিপ্লব-পূর্ববর্তী কালে দেশের অর্থনৈতিক বিকাশের মানের সঙ্গে জড়িত নয়, সেই দেশ একা সমাজতন্ত্র গড়ছে কিনা, ধনতান্ত্রিক দেশসমূহ দ্বারা বেষ্টিত কিনা, যে-সব সমাজ-তান্ত্রিক দেশ সমবেত প্রয়াসে পরস্পরকে সাহায্য করে যাচ্ছে, তাদের সঙ্গে সহযোগিতা বরছে কিনা, এই সব প্রশ্নও জড়িয়ে আছে।

শিল্পব্যবস্থার প্রসারসাধনে সোভিয়েত ইউনিয়নকেই সর্বাধিক কষ্টভোগ করতে হয়েছিল ; সেখানকার জনসাধারণকে নানা অভাব স্বীকার করে নিতে হয়েছে, সমগ্র জনসাধারণই তাঁদের বীর্যের প্রমাণ রেখেছেন। বিপ্লবের পরবর্তী দশ বছর জুড়ে, এই বিরাট দেশে পশ্চাদ্‌পদ ছোট ছোট খামার ছড়িয়ে ছিল ; দেশের দীর্ঘ বিস্তার, অথচ পরিবহণ ব্যবস্থা শোচনীয় ; রাস্তাঘাটের বিস্তার যথেষ্ট নয় ; দেশ সম্পূর্ণ একা, ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহ দ্বারা পরিবেষ্টিত। অন্যান্য বিবেচনার কথা বাদ দিলেও সোভিয়েত ইউনিয়নের আত্মরক্ষার শক্তি বৃদ্ধি করার জন্যই শিল্পায়ন দ্রুত সম্পন্ন করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। অন্য কোথায়ও থেকে সাহায্যের সম্ভাবনা তো ছিলই না, বরং বিপ্লবের পর প্রথম কয়েক বছর ধরে সোভিয়েত ইউনিয়নকে ১৪টি রাষ্ট্রের সমগ্র আক্রমণের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হয়েছিল, অর্থনৈতিক অবরোধ এবং নতুন

আক্রমণ ও প্ররোচনার আশঙ্কার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। সোভিয়েত ইউনিয়নের শিল্পায়ন শ্রমিকশ্রেণী ও জনসাধারণের এক অসামান্য কীর্তি। এঁরা সকলভাবে চেষ্টা করে গেছেন, সকল পন্থাই গ্রহণ করেছেন, দেশের পশ্চাদ্‌পদতা কাটিয়ে উঠবার তাগিদে স্বেচ্ছায় যে-কোন অভাব স্বীকার করে নিয়েছেন।

১৪টি রাষ্ট্র নিয়ে গঠিত আজকের সমাজতান্ত্রিক পরিবারের অস্তিত্বের পরিপ্রেক্ষিতে সমাজতন্ত্রের বস্তুগত ও প্রয়োগগত ভিত্তি রচনা এখন অনেক সহজ হয়ে গেছে। প্রত্যেক দেশের (বিশেষত সে দেশ যদি ছোট হয় বা তার যদি সমুদয় প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিক উপাদানসমূহ না থাকে) এখন আর আধুনিক শিল্পব্যবস্থার সামগ্রিক পরিমণ্ডল রচনায় সচেষ্ট হতে হয় না। বরং প্রত্যেকটি সমাজতান্ত্রিক দেশ অন্য সৌভ্রাত্রমূলক দেশগুলির সঙ্গে নিজেদের কর্মপরিকল্পনা যুক্ত করে নিজ নিজ প্রাকৃতিক, ঐতিহাসিক ও অর্থনৈতিক সুযোগসুবিধার কথা বিবেচনা করে অধিকতর সাফল্যের সঙ্গেই সমাজতন্ত্রের বস্তুগত ও প্রয়োগগত ভিত্তি রচনা করতে পারে। অতীতে এগিয়ে গেছে এমন কোন রাষ্ট্রের চেয়ে সমাজতান্ত্রিক পরিবারের কোন রাষ্ট্রের পিছিয়ে থাকবার কোন কারণ নেই। বরং অতীতে শিল্পগতভাবে পশ্চাদ্‌পদ দেশগুলি পারস্পরিক সাহায্য ও সমর্থনের সুযোগ লাভ করে আরো দ্রুত বিকাশলাভ করতে পারে, উন্নততর দেশগুলির অর্থনৈতিক মানে দ্রুত পৌঁছে যেতে পারে। প্রত্যেক দেশই অন্য দেশগুলির সাহায্য লাভ করে এবং সকল দেশের অর্থনৈতিক বিকাশে সাহায্য করে। ফলে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির এমন এক বস্তুগত ও প্রয়োগগত ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারে যাতে ধনতন্ত্রের চেয়ে অল্প ব্যয়ে আরো বেশি ও উন্নততর বাস্তব সুযোগ ও সুবিধা লাভ করা যায়।

অতীতে ঔপনিবেশিক বা আধা-ঔপনিবেশিক শাসনাধীন দেশ-

গুলির স্বাধীনতা প্রাপ্তির সময়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আধুনিক যন্ত্রশিল্প প্রতিষ্ঠিত না থাকায় সমাজতন্ত্রের বস্তুগত ও প্রয়োগগত ভিত্তি স্থাপন খুবই কঠিন হয়ে পড়ে। এই সব দেশের মানুষের দায়িত্ব, তাঁদের নিজস্ব অর্থনীতির সুযোগসমূহের পূর্ণতর প্রয়োগ ঘটিয়ে নিজেদের প্রয়োজনীয় ভোগ্য পণ্য উৎপাদন করা ও নিজেদের ঐতিহ্যগত রপ্তানীদ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করে নতুন শিল্পের বিকাশে রসদ সঞ্চয় করা।

স্বাধীন সমাজের কাছে শিল্পায়নের গুরুত্ব খুবই বেশি, কেননা কেবলমাত্র আধুনিক শিল্পব্যবস্থাই সাম্রাজ্যবাদী শাসনের নাগপাশ থেকে তাদের প্রকৃত স্বাধীনতাকে সম্ভব করতে পারে। নব্য উপনিবেশবাদ অর্থাৎ অতীতের উপনিবেশগুলিতে বাস্তবিক অর্থনৈতিক দখল বজায় রাখার সাম্রাজ্যবাদী চেষ্টায় নবজাগ্রত দেশগুলিতে উৎপাদনী শক্তিসমূহের বিকাশ এবং বিশেষত জাতীয় শিল্পব্যবস্থার বিকাশ বাধা পাচ্ছে। নব্য উপনিবেশবাদী নীতির সপক্ষে পশ্চিমী শক্তিবর্গ এই "তত্ত্ব" খাড়া করেছেন যে আফ্রিকায় শিল্পায়নের উপযোগী প্রাকৃতিক সম্পদ নেই এবং আফ্রিকার জলহাওয়া কেবল কৃষিরই উপযোগী। অথচ এই যুক্তি টেঁকে না, কেননা ধনতান্ত্রিক দুনিয়ার মোট হীরকের শতকরা ৯৮ ভাগ, কোবাল্ট্-এর শতকরা ৭০ ভাগ, সোনার শতকরা ৬৫ ভাগ, ম্যাঙ্গানিজ আকরের শতকরা ৪২ ভাগ, তামা ও ইউরেনিয়াম-এর এবং আরো বহু খনিজ পদার্থের শতকরা ২৫ ভাগ আসে আফ্রিকা থেকে। সঙ্গে সঙ্গেই দেখা যায় ঔপনিবেশিক শোষণের ফলে এই বিপুল সম্পদ সত্ত্বেও পৃথিবীর সমগ্র আয়ের মাত্র শতকরা তি ভাগ আফ্রিকার ভাগে পড়ে।

যথার্থ স্বাধীনতা লাভ করতে গেলে নবজাগ্রত দেশগুলিকে তাদের অর্থনীতির ঔপনিবেশিক কাঠামো সম্পূর্ণ বর্জন করতে হবে; বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত এমন এক কৃষিব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে যাতে জনসমষ্টির

চাহিদাও মেটে এবং শিল্পব্যবস্থা ও পরিবহণের উন্নতি ঘটে। নতুন দেশগুলিকে যে-সব "সাহায্য" দানের কথা সাম্রাজ্যবাদীরা এত করে লিখেছেন বা বলছেন, তার লক্ষ্য পুরনো অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকেই চালু রেখে কৃষির কাঁচা মাল সংগ্রহের ক্ষেত্ররূপে আফ্রিকাকে আন্তর্জাতিক ধনতান্ত্রিক শ্রমবিভাগের পরিমণ্ডলের মধ্যে আবদ্ধ রাখা। দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখানো যায়, ঔপনিবেশিক উন্নয়ন ও উপকার আইনের আওতায় ১৯৪৬-৫৬ সালের মধ্যে ব্রিটিশ সরকার যে ১৪ কোটি ৮০ লক্ষ পাউণ্ড বিতরণ করেছেন, তার মধ্যে মাত্র ৫৪৫,০০০ পাউণ্ড অর্থাৎ শতকরা ০·৫ ভাগ মাত্র শিল্পোন্নয়নে ব্যয়িত হয়েছে। বিদেশস্থ ফরাসী অঞ্চল-সমূহের বিকাশের জন্য প্রাথমিক পরিকল্পনায় মোট ব্যয়ের শতকরা মাত্র ০·৫ ভাগ শিল্পোন্নয়নে এবং পরিবহন ও যোগাযোগে শতকরা ৬৫ ভাগ ব্যয়িত হয়। মুক্ত দেশগুলির প্রাকৃতিক সম্পদ লুণ্ঠন করে তাদের অর্থনীতিকে পশ্চিমী শক্তিবর্গের সামরিক পরিকল্পনার প্রয়োজনানুযায়ী করে তোলার জন্যই এই অর্থ নিয়োগ করা হয়। তাছাড়াও, ঋণ বা "সাহায্য" দান করবার সময়ে পশ্চিমী শক্তিবর্গ প্রায়ই বিশেষ রাজনৈতিক শর্ত আরোপ করেছেন, নতুন রাষ্ট্রের কাছে এমন অঙ্গীকার আদায় করেছেন যে, বিদেশী পুঁজিবাদী বা একচেটিয়া কারবারীদের কারখানা বা বাগিচা তাঁরা জাতীয়করণ করবেন না। বিকাশশীল দেশগুলিকে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের "সমর্থন ও সাহায্য" করার নীতিকে ফাঁসীর দড়ির সঙ্গেই তুলনা করা যায়।

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি মুক্ত দেশগুলিকে একেবারেই অন্য ধরনের সমর্থন ও সাহায্য যুগিয়ে থাকেন। সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহ থেকে প্রাপ্ত ঋণ ও সাহায্য সকল ক্ষেত্রেই নবজাগ্রত রাষ্ট্রগুলির জাতীয় শিল্পব্যবস্থা গঠনেই নিয়োজিত হয়। নতুন রাষ্ট্রগুলির স্বাধীনতা বিঘ্নিত হতে পারে এমন কোন শর্ত এই সাহায্যের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয় না।

সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রায় ৫০০ শিল্পপ্রকল্প স্থাপনে অনেকগুলি মুক্ত দেশকে সাহায্য করেছেন। এর মধ্যে ভারতের ভিলাই লৌহ ও ইস্পাত কারখানা এবং সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের আসওয়ান বাঁধ উল্লেখযোগ্য। নতুন রাষ্ট্রগুলির হাজার হাজার বিশেষজ্ঞ সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রশিক্ষণ লাভ করছেন।

এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার মুক্ত দেশগুলির সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির যে অর্থনৈতিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে; তাতে ঋণদান ও সরবরাহের ব্যাপারে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির একচেটিয়া ক্ষমতা ভেঙে পড়েছে; নবজাগ্রত দেশগুলিকে ঋণদানের শর্তে ধনতান্ত্রিক দেশগুলি নানা সুবিধা ও ছাড় দিতে বাধ্য হয়েছে।

মুক্ত দেশগুলির সঙ্গে বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার সম্পর্কের বিস্তারে সাম্রাজ্যবাদীদের হাত থেকে একটি অত্যন্ত কার্যকর অস্ত্র, অর্থনৈতিক অবরোধের অস্ত্র, খসে পড়েছে।

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির শক্তিশালী রাষ্ট্রসমবায়ের অস্তিত্বের ভরসাতেই মুক্ত দেশসমূহ শিল্পায়ন, যথার্থ স্বাধীনতা অর্জন, এবং অধনতান্ত্রিক বিকাশের জন্য প্রয়োজন বস্তুগত ও প্রয়োগগত ভিত্তি রচনার লক্ষ্যের দিকে এগোতে পারছেন।

সমাজতান্ত্রিক বিকাশের পথ বেছে নিয়েছে যে-দেশ, সে-দেশের অর্থনৈতিক স্বয়ংভরতার অর্থ বিশ্ব অর্থনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া নয়। আধুনিক উৎপাদনী শক্তিসমূহের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই প্রয়োজন হয়ে পড়ে বৈষম্য ও অসম বিনিময় রহিত নতুন সমাজতান্ত্রিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত আন্তর্জাতিক শ্রমবিভাগ। কোন দেশই কেবল আপন সম্পদসমূহের উপর নির্ভর করে সার্থকভাবে সমাজতন্ত্রের বস্তুগত ও প্রয়োগগত ভিত্তি স্থাপন করতে পারে না। এইরকম জাতীয় সংকীর্ণতায়

অর্থনৈতিক বিকাশ বিলম্বিত হয়, অগ্রগতির বদলে অর্থনৈতিক নিশ্চলতারই পথ পরিষ্কার হয়, নয়তো জনসাধারণের বিপুল আত্মত্যাগ ও কর্মপ্রয়াস দাবি করে।

বিবেচনা করে দেখা গেছে, আন্তর্জাতিক সমবণ্টনে অংশভাক্ হবার আগে কোন দেশকে শিল্পবিকাশের অন্তত একটা নির্দিষ্ট মানে পৌছতে হয়। এই মূলগতভাবে সত্য সিদ্ধান্তটির অবশ্য যেন এমন অপব্যাখ্যা কখনই না করা হয় যে, অন্যান্য দেশের সঙ্গে উন্নয়ন পরিকল্পনার সমন্বয়ের সুবিধাসমূহ পরীক্ষা না করেই, কিংবা বিশ্ব শ্রমবণ্টনের পরিপ্রেক্ষিতে ঐ দেশের পক্ষে অর্থনীতির কোন্ কোন্ শাখার বিকাশ লাভজনক তা বিবেচনা না করেই শিল্পবিকাশের কাজ চলতে পারে। সমাজতান্ত্রিক শিবিরের অন্তর্গত দেশগুলির সঙ্গে সমবণ্টনে যোগ দিলে ন্যূনতম পুঁজি লগ্নী করে শিল্পবিকাশ সম্ভব হয়; শিল্পক্ষেত্রে এমন কোন বিপুল দীর্ঘ-মেয়াদী অর্থবিনিয়োগ করতে হয় না, যা হয়ত ফিরে পেতে দীর্ঘকাল কেটে যাবে, ভোগ্যপণ্যের উৎপাদনও কমে না।

নতুন কারখানা নির্মাণের সময়ে কৃষির বিকাশের কথাও বিবেচনা করতে হয়। কারণ নবজাগ্রত দেশগুলির অধিকাংশেই অর্থনৈতিক বিকাশের জন্য অর্থসংগ্রহের প্রধান কিংবা প্রায় একমাত্র আভ্যন্তরীণ উৎস কৃষি; শিল্পবিকাশের অর্থও আসে কৃষি থেকেই। কিন্তু লক্ষ্য রাখতে হবে, যাতে শিল্পোন্নয়নের জন্য কৃষির লভ্যাংশ বিনিয়োগ অর্থ-নৈতিক ন্যায্যতার সীমা না ছাড়িয়ে যায়। শিল্পনির্মাণে অহেতুক দ্রুততা এবং শিল্পবিকাশের জন্য স্বল্প উৎপাদনকারীর ক্ষমতাতিরিক্ত রসদ কৃষি থেকে আদায় করার প্রবণতা দেখা গেলে অগ্রগতিই ব্যাহত হবে।

সমগ্র অর্থনীতির উন্নতিসাধন ও জীবনধারণের মানোন্নয়নের সহায়ক হবে এমন ভরসা থাকলেই শিল্পনির্মাণে যথার্থ স্বয়ংভরতা ও অধনতান্ত্রিক বিকাশের সম্ভাবনা নিশ্চিত হয়।

৫। কঠিনতম দায়িত্ব (কৃষিক্ষেত্রে সংযোগ)

আমরা জানি যে বৃহদায়তন সম্মিলিত উৎপাদনই সমাজতন্ত্রের বস্তুগত ভিত্তি। অথচ অদ্যাবধি সবচেয়ে উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতেও যথেষ্ট সংখ্যক ছোট খামার থেকে গেছে, অপেক্ষাকৃত স্বল্পোন্নত দেশগুলিতে ছোট কারিগরদের শিল্প অর্থনীতির বিশিষ্ট অংশ জুড়ে থাকে। এই সব খামারে ও শিল্পে কর্মরত লোকের সংখ্যা লক্ষ লক্ষ।

সামান্য জমির অধিকারী ও ভূমিহীন কৃষকেরা জমি পাবার আশাতেই বিপ্লবে অংশ নেন। জয়যুক্ত বিপ্লব তাঁদের এই আশা ধূলিসাৎ করতে পারে না। বিপ্লবের মধ্যেই জমিদারী ব্যবস্থার অন্তর্গত জমির বৃহদংশ যাঁরা সেই জমিতে কাজ করেন, অর্থাৎ খামারের শ্রমজীবী ও দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত কৃষক তাঁদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। ফলে অর্থনীতির আয়তন তো বাড়েই না, বরং আরো খণ্ডিত হয়ে পড়ে। ফলে অধিকাংশ দেশেই কৃষিক্ষেত্রে স্বল্প উৎপাদনকারীর সংখ্যা বিপ্লবের পরেই বেড়ে যায়।

বিপ্লবের ফলে অল্পবিত্ত কৃষকের হাতে জমি দান করার ফলে এবং শ্রমিক-কৃষকও সরকারের সাহায্য লাভ করায় দরিদ্র কৃষকের সংখ্যা যথেষ্ট হ্রাস পায়। প্রাক্-বিপ্লব রাশিয়ায় প্রতি ১০০ জন কৃষকের মধ্যে ৬৫টিই অত্যন্ত দরিদ্র পরিবার থাকত, বিপ্লবের পর এই সংখ্যা ৩৫-এ নেমে আসে। কুলাকদের সংখ্যা শতকরা ৬৭ ভাগ হ্রাস পায়, মধ্যবিত্ত কৃষকদের সংখ্যা তিন গুণ বেড়ে যায়। বিপ্লব গ্রামাঞ্চলকে মধ্যবিত্ত কৃষকদের মানে পৌঁছে দেয়। ফলে ভাড়া করা চাষীর সাহায্য নেন না যে-মধ্যবিত্ত কৃষকশ্রেণী তাঁরাই গ্রামাঞ্চলের মুখ্যশ্রেণী হয়ে দাঁড়ালেন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ফ্যাসিবাদের পরাজয়ে কয়েকটি ইয়োরোপীয় ও এশীয় দেশে বিপ্লবের সাফল্যের সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়। যে কটি দেশে সমাজতান্ত্রিক

বিপ্লব ঘটে যায়, তার মধ্যে দুটিতে—চেকোশ্লোভাকিয়ায় ও জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে—ধনতান্ত্রিক বিকাশের উন্নত মানে অগ্রগতি ঘটেছিল। অন্যগুলিতে হয় মাঝারি মানের ধনতান্ত্রিক বিকাশ ঘটেছিল, নয়তো তখনও (যেমন চীনা জনগণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে, ভিয়েতনামের গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে ও কোরিয়ার জনগণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে) মুখ্যত সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতিভিত্তিক ঔপনিবেশিক বা আধা-ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা চালু রয়ে গেছে।

এই দেশগুলির অধিকাংশেই কৃষিই অর্থনীতির প্রধান অংশ জুড়ে ছিল। ১৯৩৭-৩৯ সালে কৃষিজাত উৎপাদন আলবেনিয়ার মোট উৎপাদনের শতকরা ৯০·২ ভাগ দখল করে ছিল, বুলগেরিয়ার ৭২·২ ভাগ, কোরিয়ার ৭২ ভাগ, চীনের ৬৯·৯ ভাগ, রুমেনিয়ার ৫৯·৪ ভাগ এবং হাঙ্গেরির ৫৮ ভাগ। কেবল যে ভূখণ্ড এখন জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র, সেখানেই মোট উৎপাদনের শতকরা মাত্র ১৯·১ ভাগ ছিল কৃষিজাত।

সামাজিকীকরণের যে স্তরে এই উৎপাদন ব্যবস্থা দাঁড়িয়ে ছিল, তাতে তখনই এর উপর জনগণের সামূহিক অধিকার আরোপ করা সম্ভব ছিল না।

এইসব দেশে জমিদারী ব্যবস্থার অন্তর্গত বড় জমিগুলি কৃষিজীবী ও ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের লক্ষ্যসাধন করে এবং প্রাথমিক পর্বে গ্রামাঞ্চলে উৎপাদনের বিস্তার ঘটাবার পরিবর্তে উৎপাদনকে খণ্ডিত করে।

অভাবী কৃষিকর্মীরা, খামারের কর্মীরা ও ভূমিহীন কৃষকেরা জমি পান, জীবনধারণের উন্নততর মানে পৌঁছোন, এটা নিশ্চয়ই অগ্রগতির লক্ষণ। এতে প্রমাণ হয় যে, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব কেবল শহরের

শ্রমিকদের স্বার্থেই পরিচালিত হয় না, লক্ষ লক্ষ কৃষিজীবীরও স্বার্থ-সাধন করে। কৃষিনির্ভর দেশে কৃষকেরাই সর্বপ্রথম বিপ্লবের সুফল উপলব্ধি করেন। উদাহরণ স্বরূপ দেখা যায়, রাশিয়ার কৃষকেরা বহুযুগ স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ পান নি। তাঁরা ক্ষুধার্ত থেকেছেন, আর তাঁদের কাজের ফলভোগ করেছে জমিদার ও পুঁজিবাদীশ্রেণী। বিপ্লবের পরেই কৃষকেরা সর্বপ্রথম তাঁদের নিজেদের কাজের ফলে নিজেরা অংশভাক্ হলেন, যথার্থ স্বাধীনতা অর্জন করলেন—নিজেদের তৈরি খাদ্য খাবার স্বাধীনতা, অভাবের থেকে মুক্তি। সোভিয়েত শাসনের আদিপর্বে ২৬টি রুশ প্রদেশে শস্যের উৎপাদন ও ব্যবহারের পরিসংখ্যান লক্ষণীয়। তাতে দেখা যায় ১৯১৮-১৯ সালে নতুন প্রজাতন্ত্রের সবচেয়ে কষ্টকর পর্বে শস্যোৎপাদক অঞ্চলে শহরের শ্রমিকেরা প্রত্যেকে ১৫২ কিলো ও কৃষকেরা প্রত্যেকে ২৭০ কিলো রুটি খেয়েছেন।

কৃষকদের জীবনযাত্রার মানের উন্নতিতে শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে তাঁদের ঐক্য দৃঢ়তর হয়। এই ঐক্য ছাড়া সমাজতন্ত্র গড়ে তোলা যায় না।

তবু বুঝতে কষ্ট হয় না যে ভূমিহীন এবং স্বল্পভূমিভোগী কৃষকদের মধ্যে জমিদারী ব্যবস্থার জমি ভাগ করে দিয়ে ছোট ছোট খামারের পত্তন প্রথম দিকে জীবননির্বাহের মান উন্নত করলেও এই বিভাজনে দেশের অর্থনৈতিক বিকাশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

দরিদ্র কৃষকদের কথা তো দূরের কথা, মধ্যস্তরের কৃষকেরাও যন্ত্র ক্রয় করে শ্রমের উৎপাদিকাশক্তি ও উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধির সঙ্গতি রাখেন না। ফলে জীবননির্বাহের মানের আর উন্নতি সম্ভব হয় না। উপরন্তু ছোট চাষীদের উপর প্রতিষ্ঠিত অর্থনীতিতে সামান্য হারে হলেও নতুন ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির বীজ নিহিত থাকে, ধনী কৃষকেরা খামারের কর্মীদের শোষণ করেন।

শহরে খামারের উৎপন্নের সরবরাহ ক্রমশই কমতে থাকে।

বিপ্লবের আগে যে-পরিমাণ উৎপন্ন হত, ১৯২৬-২৭ সালে রাশিয়া সেই পরিমাণ শস্যই উৎপাদন করে। অথচ মধ্যস্তরের কৃষকদের শ্রেণী সৃষ্টি হওয়ায় শহরে সরবরাহ প্রতি ১০০ কিলোর মধ্যে ২৬ কিলো থেকে কমে ১৩ কিলোয় এসে দাঁড়ায়। বাজারে শস্যের বিক্রয়ও প্রায় অর্ধেক হয়ে যায়। শস্য রপ্তানী প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। শিল্পায়ন, নতুন শহর গড়া ও নাগরিকশ্রেণীর সংখ্যা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গেই দেশে শস্যের অভাব দেখা যায়। এতে সামগ্রিকভাবে শিল্প ও কৃষির বিকাশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

কৃষিক্ষেত্রে এহেন পরিস্থিতি অধিক দিন স্থায়ী হতে পারে না। বৃহদায়তন সমাজতান্ত্রিক শিল্প দ্রুতগতিতে বিকাশলাভ করতে থাকে, অথচ ছোট খামারগুলি নাগরিক জনগণকে যথোপযুক্ত পরিমাণ খাদ্য বা শিল্পকে কাঁচা মাল যোগাতে পারে না।

এই পরিস্থিতিতে শ্রমজীবী কৃষকদের জীবননির্বাহের মানোন্নয়নের স্বার্থে এবং সমাজতান্ত্রিক শিল্পব্যবস্থা ও ক্ষুদ্রায়তন খামারের বিকাশের দ্বন্দ্বের নিষ্পত্তিকল্পে উৎপাদন সমবায় প্রতিষ্ঠা করতে হয়। বিচ্ছিন্ন ক্ষুদ্র কৃষক পরিবারগুলি স্বেচ্ছায় সমবায়ে সংগঠিত হয়, জমি, উপকরণ ও পশুসম্পত্তির যৌথ অধিকার স্বীকার করে নেয়।

যৌথ কর্মপদ্ধতিতে খামারগুলি লোকবল ও উৎপাদনের উপায়-সমূহের একত্রীকরণের (জমি, উপকরণাদি) যথাসংগত সুযোগ গ্রহণ করতে পারে। সুসম্বদ্ধ সংগঠন থাকলে কৃষকদের নিজেদের সম্পদসমূহের শুধু একত্রীকরণেই, নতুন যন্ত্রপাতি কাজে না লাগিয়েও উৎপাদনীশক্তি বাড়িয়ে তোলা যায়। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে কৃষক পরিবারগুলিকে উৎপাদন সমবায়ে প্রাথমিকভাবে একত্রিত করেই কৃষকদের উৎপাদনী শক্তি শতকরা ২৫ থেকে ৩০ ভাগ বাড়িয়ে তোলা সম্ভব হয়।

যে-সব দেশে সাধারণভাবে শিল্প ও বিশেষত কৃষি-যন্ত্রপাতির উৎপাদন যথেষ্ট বিকাশলাভ করে নি, অথচ গ্রামে প্রচুর সংখ্যক বেকার ও আধা-বেকার শ্রমিক পাওয়া যায়, সেখানে যন্ত্র ব্যবহার না করেই উৎপাদন চালিয়ে যাবার এই ব্যবস্থা মোটামুটি দীর্ঘকাল চালু রাখা যায়। সমবায়গুলিকে আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি সরবরাহ করার মত অবস্থা এসে গেলেই কৃষি ব্যবস্থাকে ক্রমে ক্রমে যন্ত্রায়িত উৎপাদনের দিকে এগিয়ে দিতে হয়।

যেখানে অল্পপরিমাণ কৃষি যন্ত্রপাতি নির্মিত হয় এবং সমবায়গুলি প্রাথমিক স্তরে অবস্থিত থাকায় আধুনিক যন্ত্রপাতি ক্রয় করতে পারে না, সেখানে সরকার নিজ ব্যয়ে বা সমবায়গুলির যোগদানে রাষ্ট্রীয় যন্ত্র ও ট্র্যাক্টরের কেন্দ্র স্থাপন করে কৃষকদের সাহায্য করেন।

এই কেন্দ্রগুলি সমবায়ের আয়ত্তাধীন জমি কর্ষণ করে দেয়, বীজ বপন করে এবং নির্দিষ্ট হারে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে (অর্থে বা অন্যভাবে, স্থানীয় পরিস্থিতি বিচারে) শস্য গোলায় তুলে দেয়। কিভাবে জমি তৈরি করতে হয়, ট্র্যাক্টর, হার্ভেস্টার কম্বাইন বা অন্যান্য কৃষি যন্ত্রপাতি কিভাবে চালাতে হয়, এসম্পর্কেও এই কেন্দ্র থেকে কৃষকদের শিক্ষাদান করা হয়।

সমবায়গুলি যখন আরো শক্তিশালী হয়ে ওঠে, তাদের আয় বৃদ্ধি পায়, খামারের যন্ত্রপাতি দেশে আরো বেশি পরিমাণে পাওয়া যায়, তখন তারা রাষ্ট্রের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি কিনে নিতে পারে।

এক ধরনের রাষ্ট্রিক উৎপাদন ও কৃষকদের প্রয়োগগত সাহায্য যোগানোর উপায়স্বরূপ যন্ত্র ও ট্র্যাক্টর কেন্দ্র সোভিয়েত ইউনিয়নে ১৯২৯ সালে প্রথম পত্তন হয়। এগুলি ৩০ বছর বর্তমান ছিল এবং এই সময়ে যৌথ খামারের বিকাশ ও উন্নতিসাধনে এবং কৃষিকর্মে নিযুক্ত

কর্মীদের প্রশিক্ষণদানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। আজ সোভিয়েত ইউনিয়নে খামারের যন্ত্রপাতির বৃহদংশই রাষ্ট্রীয় খামার ও সমবায়ের সম্পত্তি। সমবায়গুলি তাদের নিজেদেরর যন্ত্রপাতি সারিয়ে নেয় ও বিশেষ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান মারফত নতুন যন্ত্র কেনে।

যন্ত্র ও ট্র্যাক্টর কেন্দ্রগুলি অদ্যাবধি অধিকাংশ জনগণতান্ত্রিক দেশেই বিভিন্ন রূপে ও বিভিন্ন পরিবেশে চালু আছে। এই সব দেশে এই কেন্দ্রগুলি সমবায়গুলির সম্প্রসারণে, উৎপাদনের উন্নতিসাধনে, উৎপাদন ক্ষমতা বর্ধনে, বিপণন ব্যবস্থায় ও উৎপাদন লাভজনক করে তোলায় সাহায্য করে।

সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে সমবায় ব্যবস্থার প্রসাদে কৃষিজ দ্রব্যের বিক্রেয় অংশ ১৯১৩ সালে শতকরা ২৯ ভাগ থেকে বেড়ে ১৯৬০ সালে শতকরা ৪৫ ভাগ দাঁড়িয়েছে, পশুপালনের ক্ষেত্রেও বিক্রেয় পণ্যের হার শতকরা ৩৮ থেকে বেড়ে ৫৮ ভাগ হয়েছে। ফলে কৃষকেরা উন্নততর জীবনমানের অংশীদার হয়েছেন।

এইভাবেই কৃষি অর্থনীতির সামাজিক ও প্রয়োগগত পুনর্গঠন ঘটে। অর্থনীতির সম্প্রসারণ ও সামাজিকীকরণ ঘটে, এবং এইভাবে তার বিকাশের সুযোগও বেড়ে যায়। কৃষকেরা সমবায়ের সমানাধিকার-ভোগী সদস্য হন এবং নিজেদের কাজের পরিমাণ ও মান অনুপাতে বেতন পান ও কর্মের অধিকার লাভ করেন। সমবায়গুলিতে দারিদ্র্য ও মানুষের শোষণে মানুষের দুর্দশার অবসান ঘটে। রাষ্ট্রিক কৃষি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে একযোগে সমবায়গুলির বৃহদায়তন যন্ত্রায়িত সামাজিক অর্থনীতি সমাজবাদী অর্থনীতির সুদৃঢ় ভিত্তি যোগায়। উৎপাদন সমবায় সংগঠনের সঙ্গে সঙ্গেই দরিদ্র, মধ্য ও উচ্চবিত্ত কৃষকদের সামাজিক বিভাগের বিলোপ ঘটে। ব্যক্তিগত ব্যবসায়ী, শিল্পপতি ও কুলাকের মত নতুন পুঁজিতন্ত্রী শক্তি মাথা চাড়া দিয়ে উঠবার সকল সম্ভাবনাই

অন্তর্হিত হয়। এইভাবেই দেশের মধ্যে সমাজতন্ত্রের সামগ্রিক প্রতিষ্ঠা সুনিশ্চিত হয়।

উৎপাদনে ও গ্রামদেশের জীবনধারায় মৌলিক পরিবর্তন ঘটাতে পারে বলেই যৌথ কৃষি যথার্থ বিপ্লবের লক্ষণবহ।

কৃষক, কারিগর, কুটিরশিল্পী ও ছোট ব্যবসায়ীরা যখন সমবায়ে সম্মিলিত হয়, তখনই রূপান্তরকালীন অর্থনীতি একমুখী হয়। সমাজবাদী উৎপাদনব্যবস্থা তখন আর বহু শাখায় বিভক্ত থাকে না, সকল শাখাই এক সমাজবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অঙ্গীভূত হয়।

কৃষিক্ষেত্রে সমবায় ব্যবস্থা সম্পূর্ণ পত্তন হলেই বলা যায় সমাজ-তন্ত্রের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, রূপান্তরকাল শেষ হয়েছে।

রাষ্ট্রিক অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলি কৃষকসমবায় প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিপ্লবের পর পুঁজিতান্ত্রিক খামারগুলির বৃহদংশেরই জাতীয়করণ হয়, কৃষকদের মধ্যে এই সম্পত্তি বিতরণ না করে তা রাষ্ট্রেরই করায়ত্ত রাখা হয়। এই খামার ও বৃহদায়তন জমিদারীগুলিকে রাষ্ট্রীয় খামারে রূপান্তরিত করা হয়। বিপ্লবের আগে পুঁজিতান্ত্রিক বিকাশ যতটা উঁচু স্তরে পৌঁছে থাকে, রাষ্ট্রীয় খামারগুলি ততই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে, এবং এই খামারগুলি কৃষকদের সামনে বৃহদায়তন সামাজিক উৎপাদনের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে।

সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজবাদী দেশগুলিতে সমবায়ের মধ্য দিয়ে কৃষির পুনর্গঠনের যে অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয়েছে, তা থেকে এমন কয়েকটি সিদ্ধান্তে পৌঁছনো যায় যা অন্য যেসব দেশ সমাজবাদী গঠনকর্মের এই গুরুতর সমস্যা এখনও সমাধান করতে পারে নি, তাদের কাজে লাগবে।

প্রথমত, সমবায়ের সদস্য হওয়া কৃষকদের ইচ্ছার উপর ছেড়ে দিতে হবে। তত্ত্ব হিসেবে এটা প্রত্যেকেই অনেক দিন থেকেই জানেন এবং

মানেন। কিন্তু প্রয়োগের ক্ষেত্রে নানা কারণে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে সমবায়ের পত্তন দ্রুততর করার জন্য নানা পন্থা অনুসৃত হয়েছে, এবং এই পন্থাগুলি সবসময়ে সঠিকও ছিল না। এই পন্থাগুলির মধ্যে একটি ছিল রাষ্ট্রকে নির্দিষ্ট মূল্যহারে কৃষিজ দ্রব্যের আবশ্যিক যোগান; এতে ব্যক্তিগত স্বল্পায়তন চাষে লাভ থাকত না, কখনও একেবারেই অসম্ভব হয়ে উঠত। একই উদ্দেশ্যে কখনও আবার ছোট উৎপাদকদের উপর এমন করভার চাপানো হত যে নিজেদের খামারে কাজ করার সব উৎসাহই তারা হারিয়ে ফেলত।

স্বভাবতই এইসব পন্থায় কৃষকেরা তাড়াতাড়ি সমবায়ে যোগ দিতে বাধ্য হতেন। কিন্তু তাঁরা যোগ দিতেন ছোট খামারের তুলনায় বৃহদায়তন সামাজিকীকৃত অর্থনীতির উপযোগ উপলব্ধি করে নয়, ছোট খামারে লাভের পথ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বাধ্য হয়ে। এইভাবে সমবায় গঠন করতে গেলে তাতে উৎপাদনের প্রত্যাশিত বৃদ্ধি তো ঘটেই না, বরং কৃষি উৎপাদনের গুরুতর ক্ষতি সাধিত হতে পারে। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা, এ ধরনের পন্থায় স্বল্পবিত্ত কৃষকেরা বিক্ষুব্ধ হন, তাঁরা নিজেদের জন্য এবং দেশের জন্য তাঁদের অর্থনীতির সমূহ সুযোগ গ্রহণে পরাঙ্‌মুখ হন।

দ্বিতীয়ত, এ কথাও তত্ত্বগতভাবে বহুদিনই সুবিদিত যে কৃষি-সমবায়গুলির জন্য নতুন ও আরো বেশি উৎপাদনক্ষম কৃষিযন্ত্র প্রয়োজন। কিন্তু কৃষিক্ষেত্রে কিভাবে ও কখন এটা সম্ভব হতে পারে? বিভিন্ন দেশে সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকর্মের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন সমাধান প্রস্তাবিত হয়েছে। কেউ কেউ এমনও ভেবেছেন যে সমবায় প্রতিষ্ঠার আগেই যথেষ্ট পরিমাণে কৃষিযন্ত্র উৎপাদনে সমর্থ এক শিল্পব্যবস্থা পত্তন করা উচিত।

কিন্তু এই দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করলে সমবায়ের প্রতিষ্ঠা বহু দীর্ঘ বছর

পিছিয়ে যেতে পারে, বিশেষত সেইসব দেশে যেখানে উন্নত শিল্পব্যবস্থা গড়ে ওঠে নি। ইতোমধ্যে কৃষকেরা দারিদ্র্যে জীবন যাপন করবেন, সারা দেশ কৃষিজ উৎপাদনের অপ্রাচুর্যে কষ্টভোগ করবে। গ্রামাঞ্চলে বিচ্ছিন্ন স্বল্পবিত্ত কৃষকনির্ভর অর্থনৈতিক :ব্যবস্থা থেকে কুলাক, ব্যবসায়ী ও মেহনতি মানুষের শোষকশ্রেণীভুক্ত পুঁজিপতিদের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটবে। তাছাড়াও রাষ্ট্র ও শহরের শ্রমিকেরা যতদিন না উপযুক্ত যন্ত্রপাতি নির্মাণ করে উঠতে পারে, ততদিন কৃষকদের অপেক্ষা করে থাকতে হবে। এই দৃষ্টিকোণ সঠিক বলে মানা যায় না। সমবায়ের জন্য যে যন্ত্রপাতি প্রয়োজন, তার উৎপাদনে কৃষকদেরও ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। সমবায়ে যোগ দিয়ে ও যৌথ চাষের বিস্তার ঘটিয়ে কৃষকেরা যে-সম্পদ সঞ্চয় করেন, তা কৃষিযন্ত্রপাতি উৎপাদনের আংশিক পুঁজি যোগাতে পারে। নিজেদের উপকরণাদি জড় করে সমবায়গতভাবে তা ব্যবহার করেই সাধারণ কৃষকেরা উৎপাদন বাড়াতে পারেন, গ্রামাঞ্চলে জীবনমানের উন্নতি সাধন করতে পারেন, শিল্পের বিকাশ ঘটাতে পারেন।

তৃতীয়ত, কোন কোন দেশে সমবায়ের আয়ের অংশ বিতরণের সময় সমবায়ে যোগদান কালে এক একজন কৃষক যে ভারবাহী পশু, উৎপাদনী পশু ও উপকরণাদি দান করেছেন, তা আর হিসেবে ধরা হয় না। উচ্চবিত্ত কৃষক বেশি দান করেছিলেন, মধ্যবিত্ত কৃষক তার চেয়ে কম দান করেছিলেন, স্বল্পবিত্ত কৃষক অনেক ক্ষেত্রে বলতে গেলে কিছুই দান করেন নি। এই ধরনের সমবায়গুলি ছিল দুর্বল। প্রচুর পরিমাণে রাষ্ট্রীয় সাহায্য এদের পক্ষে অপরিহার্য ছিল। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে, আয় বণ্টনকালে সমবায়ের পক্ষে প্রয়োজনীয় মূল্যবান সম্পত্তি বা জমির দাম সঙ্গে সঙ্গেই বা ক্রমে ক্রমে মিটিয়ে দিতে পারলে মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত কৃষকেরা তখনই সমবায়ের প্রতি আকৃষ্ট হন ও তার কাজ

সহজতর হয়। উপরন্তু সমবায়ে প্রদত্ত উপকরণ ও পশুর দাম দেওয়া হয়, এই ভরসায় কৃষকেরা সমবায়ে যোগ না দেওয়া অবধি এইগুলি সযত্নে রক্ষা করার তাগিদ অনুভব করেন।

যেসব দেশে সমবায়ে প্রদত্ত সম্পত্তির কোন দাম দেওয়া হয় নি, সেইসব দেশে পশু পালনে যথেষ্ট ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছে। সমবায়ে যোগদানের আগে বহু কৃষকই পালিত পশু হয় মেরে ফেলেছেন নয় বেচে দিয়েছেন। এইসব ক্ষেত্রে সমবায়গুলি বহুদিন পর্যন্ত পশুপাল প্রাক্‌সমবায় পর্বের স্তরে নিয়ে যেতে পারেন নি। এতে জাতীয় অর্থ-নৈতিক ব্যবস্থা বিপুলভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, জীবনমান ক্ষুণ্ণ হয়েছে।

চতুর্থত, কয়েকটি দেশের অভিজ্ঞতা থেকে এই ধারণা সৃষ্টি হয়েছিল যে সমবায় ব্যবস্থা যেহেতু কৃষকদের জীবনযাত্রার ধরনে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন, সেজন্য উৎপাদনের পরিমাণ তাতে কিছুটা হ্রাস পেতে বাধ্য। কিন্তু হাঙ্গেরির মত কয়েকটি দেশের অভিজ্ঞতায় বরং এর বিপরীতটাই দেখা গেছে। সমবায়ের যথোপযুক্ত প্রস্তুতি থাকলে, সমবায়ের সদস্যত্ব সম্পূর্ণত স্বেচ্ছাকৃত্য হলে, নতুন চাষের ব্যবস্থায় অবিচল আস্থা থাকলে এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশ অনুকূল হলে কৃষির সমাজ-তান্ত্রিক রূপান্তরের সঙ্গে সঙ্গেই সাময়িক উৎপাদন হ্রাস ঘটবে না, বরং মোট বিক্রেয় পণ্যের বৃদ্ধিই ঘটবে।

পঞ্চমত, সমাজতান্ত্রিক ধারায় গ্রামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সংগঠন-কালে সঙ্গে সঙ্গেই কৃষকদের কাছে বিচ্ছিন্ন চাষ থেকে বৃহদায়তন যৌথ চাষের সুবিধাগুলি (এই সুবিধাগুলি শুরুর দিকে গৌণমূল্য হলেও) তুলে ধরতে হবে। সমবায় অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রত্যেক বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গেই যত সামান্যই হোক জীবনমানের কিছুটা বাস্তব উন্নতি দেখাতে হবে। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এই থেকেই সমবায়ের

সদস্যেরা অনুভব করতে পারেন যে তাঁরাই এর প্রভুস্থানীয় এবং তা থেকেই উৎপাদনের উন্নতি ও বৃদ্ধি ঘটাবার তাগিদ আসে।

ষষ্ঠত. সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার অন্তর্গত ক্ষেত্র ও সমবায়ের সদস্যদের ব্যক্তিগত জমিগুলির পরিমাণের মধ্যে এক সঠিক অর্থনৈতিক অনুপাত স্থির করা প্রয়োজন।

সমাজতান্ত্রিক ও ব্যক্তিগত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সমূহ সম্ভাবনার সুবিবেচিত মূল্যবিচারের ভিত্তিতেই অন্য সব প্রশ্নের মতই এই প্রশ্নটিরও সমাধান করতে হবে। বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে যতদিন পর্যন্ত সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা স্বল্প সংখ্যক শ্রমিক বিনিয়োগ করে কৃষকদের প্রয়োজনীয় যাবতীয় পণ্য উৎপাদন করতে না পারে ততদিন পর্যন্ত সমবায়-সদস্যের ব্যক্তিগত সম্পত্তি (কিছু গৃহপালিত পশু, ট্রাক গার্ডেন বা ফলবাগান) অর্থনীতিবিচারে সমর্থনীয়। সেই লক্ষ্যে পৌঁছনোর আগে প্রশাসনিক সিদ্ধান্তক্রমে বা অন্যভাবে চাপ দিয়ে সমবায় সদস্যদের ব্যক্তিগত ভূসম্পদ সংকোচন বা খারিজ করার চেষ্টা করলে দেশের কৃষিজ উৎপাদন হ্রাস পাবে এবং কৃষকসমাজসহ সমগ্র জনমণ্ডলীর রসদ যোগানে ঘাটতি পড়বে।

কৃষকেরা যে-পথে সমাজতন্ত্রের দিকে এগোন, সে-পথ শ্রমিকদের পথ থেকে আলাদা। সে-পথ অনেক বেশি জটিল, কারণ বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিগত মালিকানাধীন খামারগুলিকে জড়িয়ে সমবায় গড়তে গেলে অসংখ্য অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক প্রশ্ন বিবেচনা করতে হয়।

পুঁজিতান্ত্রিক সমাজেও শোষকেরা সমবায়-নির্ভর অর্থনীতি ব্যবহার করে নিজেদের অর্থকরী স্বার্থসাধনে, কিন্তু লোকায়ত্ত শাসনব্যবস্থায় তা জনস্বার্থে নিয়োজিত সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক সংগঠন হয়ে ওঠে।

সমাজতন্ত্রের পথে অগ্রসরমাণ সকল দেশকেই কৃষিক্ষেত্রে সমবায়

পত্তনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। যেসব দেশ ঔপনিবেশিক নির্ভরতা থেকে নিজেদের মুক্ত করেছে, সেই সব দেশকেও এই সমস্যার মোকাবিলা করতে হয়। এই সব দেশে কৃষকদের সংখ্যাধিক্যের ফলেও আধুনিক শিল্পব্যবস্থার প্রায় কোন চিহ্ন না থাকায়, কৃষিসমবায় নানা অসুবিধার সম্মুখীন হয়। শিল্পব্যবস্থার দুর্বলতাই প্রধান অসুবিধা হয়ে দাঁড়ায়। এই দেশগুলির অনেকগুলিতেই সংগঠিত বিপুল সংখ্যক শ্রমিকশ্রেণী নেই, এবং কৃষকদের সমবায় গঠন শ্রমিকশ্রেণী সৃষ্টির পাশাপাশিই চলতে থাকে। এই সব দেশে সমবায়ের উপযোগী যাবতীয় কৃৎকৌশলগত ব্যবস্থা আয়ত্ত না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা অবিবেচকের কাজ হবে, কারণ নতুন শাসকগোষ্ঠী সহায় না হলে স্বল্প সম্পদের উৎপাদকেরা স্থানীয় ধনিকগোষ্ঠী বা বিদেশী পুঁজিপতিদের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়বে।

এই পরিস্থিতিতে অনিবার্যভাবে গ্রামাঞ্চলে ধনী-দরিদ্রের বিভেদ দ্রুত ঘটে যাবে, পুঁজিতান্ত্রিক ধরনের বিকাশের দিকে প্রবণতা দেখা যাবে।

প্রাক্তন উপনিবেশগুলিতে কৃষিব্যবস্থার সমাজতান্ত্রিক পুনর্নির্মাণের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। আফ্রিকার সেরা জমিগুলি (যেমন কেনিয়ায়) ছিল বিদেশী একচেটিয়া মালিকদের হাতে। তারা এই জমিতে রপ্তানীর ফসল ফলাত। কৃষির উপজাতিক ও গোষ্ঠীগত ব্যবস্থায় উপজাতিক অভিজাতশ্রেণীর হাতেই জমির দখল ছিল, অথচ তারই পাশাপাশি পুঁজিতান্ত্রিক বাগিচা বর্তমান ছিল। জমির ব্যক্তিগত মালিকানা না থাকায়; উপজাতিক গোষ্ঠীপতিরা সবচেয়ে ফলদ জমি দখল করে নিয়ে কৃষকদের সেই জমিতে কাজ করতে বাধ্য করে খাজনা আদায় করতে পারতেন। অধিকাংশ আফ্রিকান দেশেই কৃষকসমাজ পর্যাপ্ত জমির অভাবে কষ্টভোগ করেন। সেই কারণেই

সকল মুক্ত দেশেই জমির সমস্যা প্রাথমিক সমস্যা, কঠিন সমস্যা। জাতীয় সরকার কায়েম হবার পর প্রথম কয়েক মাস ধরেই কৃষিসংস্কারের কাজ চলে, কিন্তু তা নানা রূপ নেয়। কোন কোন দেশে পুরনো শোষকেরা নতুন ও প্রগতিশীল কর্মসূচীর রূপায়ণে বাধা দেয়। কোন কোন দেশে বিদেশী বুর্জোয়া শাসনের প্রভাবে কৃষি সংস্কার ইওরোপীয় উপনিবেশবাদীদের কাছ থেকে জমি কিনে নিয়ে স্থানীয় উচ্চবিত্ত কৃষকদের কাছে বেচে দেওয়ার মধ্যেই সমাধা হয়েছে। এ ধরনের সংস্কারে কৃষকসমাজের বৃহদংশের অবস্থার কোন উন্নতি হয় না; স্বল্প উৎপাদনকারীদের উপর শোষণ কায়েম থেকে যায়। ভূমি সমস্যার এই অগণতান্ত্রিক সমাধানে গ্রামাঞ্চলে শ্রেণীবিভেদ বেড়ে যায়, পুঁজিতান্ত্রিক বিকাশের পথ খুলে যায়।

অ-ধনতান্ত্রিক বিকাশের সহায়ক গণতান্ত্রিক কৃষিসংস্কারে নতুন রাষ্ট্রগুলি শুধু বিদেশী পুঁজিপতিদেরই নয়, স্থানীয় প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিবর্গেরও অটল প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়। বিচিত্র ধরনের প্রতিরোধের সঙ্গে লড়াই করে বহু আফ্রিকান দেশ কৃষিসমস্যার সমাধান করছে, কৃষকসমবায়ের সঙ্গে এই সমাধানকে যুক্ত করছে।

যেসব দেশে মুক্তিলাভের আগেই গোষ্ঠীগত চাষের ব্যবস্থা ছিল এবং মুক্তির পরই নানা ধরনের কৃষকসমবায় গড়ে উঠতে থাকে, সেইসব দেশে শুধু পুঁজিতন্ত্রের পর্বই নয়, জমির ব্যক্তিগত মালিকানার পর্বও এড়িয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে।

৬। পরিকল্পনা ও বাজার

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের আগে অর্থনীতির সকল ক্ষেত্রেই নিয়মরহিতভাবেই অর্থাৎ কোন কেন্দ্রীয় নির্দেশ বা পরিকল্পনা ছাড়াই বিকাশ লাভ করতে থাকে। প্রত্যেক মালিকই তাঁর নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থ মেনে ও নিজের মর্জিমাফিক তাঁর কাজ চালিয়ে যান। সমাজে

বিভিন্ন শ্রেণীর অস্তিত্ব থাকে,তাই এইসব শ্রেণীর স্বার্থের মধ্যে মিল হয়না। কোন বড় জমিদার কখনই নিজে চাষ করে না। সে অর্থ বা ফসলের বিনিময়ে (যতটা বেশি পারে আদায় করে নিয়ে) চাষীকে জমি বিলি করে। কাপড়কলের মালিক শ্রমিক ও কাঁচা মালের জন্য যথাসম্ভব কম খরচ করে তৈরি মাল সর্বোচ্চ সম্ভাব্য দামে বেচবার চেষ্টা করে। যে চাষী জমি চাষ করেন, তিনিও চান সবচেয়ে বেশি লাভ রেখে তাঁর পণ্য বেচবার, যাতে তিনি তাঁর নিজের ও তাঁর পরিবারের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য কিনতে পারেন। আবার বড় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের দালালেরা তাদের মালিকের মুনাফা বাড়াবার উদ্দেশ্যে এই পণ্যের জন্য যথাসম্ভব কম দাম দেবার চেষ্টা করে। এইভাবেই বিভিন্ন শ্রেণীর অন্তর্গত মানুষের স্বার্থের সংঘাত বাধে। প্রত্যেকেই নিজের ঝুঁকি ও দায়িত্বে কাজ করে।

বিরোধী স্বার্থের সংঘাতের ফলে সমাজ শ্রেণীবিশেষ বা গোষ্ঠী-বিশেষের স্বার্থ ধরে এগোয় না। ব্যক্তিগত মালিকানায় প্রতিষ্ঠিত সমাজের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা জনসাধারণের ইচ্ছার অনুসারী নয়। এই পরিস্থিতিতে বাজার. তথা উৎপাদকদের মিলন ক্ষেত্রের চাপেই অর্থ-নৈতিক বিকাশ ঘটে। বিভিন্ন পণ্যের বাজারদর থেকেই তাদের চাহিদা বোঝা যায়। যদি চাহিদা বেশি হয়, যোগান কম হয়, দাম বাড়ে। উল্টোদিকে যদি যোগান বেশি হয়, চাহিদা কম হয়, দাম পড়ে। বাজার-দরের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই বিভিন্ন পণ্যের উৎপাদন বাড়ানো বা কমানো হয়। অর্থাৎ ব্যক্তি মালিকদের সমাজে পরস্পরের স্বার্থের সংঘাত বাধে, প্রত্যেকেই নিজের ব্যক্তিগত লক্ষ্য অনুসরণ করে যায়, সমগ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিকাশে কেউই উৎসাহী নয়। ফলে বাজারই অর্থনৈতিক ব্যবস্থার স্বয়ম্ভূ নিয়ন্তা হয়ে দাঁড়ায়।

বৃহদংশের সাধারণ লক্ষ্য ও স্বার্থের জন্যই জনসাধারণের হাতে গড়া

সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক বিকাশ বাজারের কর্তৃত্বে চলে না। উৎপাদনের উপকরণসমূহ জনসাধারণের মালিকানায় থাকায় সকল উৎপাদকই একই অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অন্তর্গত হয়। ফলে সরকারি ব্যবস্থায় প্রতিফলিত সমগ্র সমাজের সচেতন পরিকল্পিত নেতৃত্বের পরিচালনায় অর্থনৈতিক বিকাশ ঘটে।

সরকারি মালিকানা ও উৎপাদকদের স্বার্থ ও লক্ষ্যের ঐক্যে যে শুধু উৎপাদন, বাণিজ্য ও ভোগের নিকট ভবিষ্যতের ধারণা লাভ করা যায়, তা-ই নয়, সমগ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পরিচালিত করবার নির্দেশও লাভ করা যায়। বুর্জোয়া সমাজেও অবশ্য এক একটি শিল্প-দ্রব্যের চাহিদা ও যোগানের অনুপাত এবং দামের তারতম্য বিচার করে অর্থনৈতিক বিকাশ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্‌বাণী করা যায়। কিন্তু বুর্জোয়া অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কখনই সামগ্রিকভাবে সমাজবিকাশে সুচিন্তিত কোন লক্ষ্য নির্দেশ বা সাধন করতে পারে না। ব্যক্তিগত মালিকানা ও ব্যক্তির স্বার্থের উপর নির্ভরশীল বুর্জোয়া অর্থনৈতিক ভবিষ্যদ্‌বাণীকে আবহাওয়ার ভবিষ্যদ্‌বাণীর সঙ্গে তুলনা করা যায়। আবহাওয়া কেন্দ্র যত সঠিকভাবেই আবহাওয়ার ভবিষ্যদ্‌বাণী করুক না কেন, তারা কেবল ভবিষ্যদ্‌বাণীই করতে পারে আবহাওয়া তৈরি করতে পারে না। বুর্জোয়া সমাজও তেমনি নিকট ভবিষ্যতে বাজারের অবস্থা সম্পর্কে ভবিষ্যদ্‌বাণী করতে পারে, কিন্তু তাকে বদলাতে পারে না, বাজারের অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করতে পারে না, অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে না।

সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিকল্পিত পরিচালনায় শুধু যে নিকট ভবিষ্যতে অর্থনৈতিক বিকাশের ভবিষ্যদ্‌বাণী করা যায়, তাই-ই নয়, নির্দিষ্ট লক্ষ্যানুসারে এই বিকাশকে পরিচালিত করা যায়। সমাজতান্ত্রিক সমাজে পরিকল্পিত বিকাশ অপরিহার্য। এর জন্য যা প্রয়োজন

হ'ল প্রথমত জনসাধারণের হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা, দ্বিতীয়তঃ শিল্প, পরিবহণ, ব্যাঙ্ক ও বাণিজ্যে রাষ্ট্রের মুখ্য ভূমিকা ও বৈদেশিক বাণিজ্যে রাষ্ট্রের একচেটিয়া ক্ষমতা। সমাজতান্ত্রিক ক্ষেত্র আয়ত্তে থাকলে সরকার অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিকাশ পরিকল্পনা করে ফেলতে পারে, নির্দিষ্ট লক্ষ্য স্থির করে সেই লক্ষ্যসাধনের উপযোগী অবস্থা সৃষ্টি করতে পারে, এবং করাও উচিত তাই-ই। সমাজতন্ত্রে উৎপাদনে নৈরাজ্যের স্থলে পরিকল্পিত উৎপাদনের সূচনা হয়। এই উৎপাদনের লক্ষ্য থাকে সামগ্রিকভাবে সমাজের চাহিদা ও প্রত্যেক সামাজিকের চাহিদা পূরণ।

সমাজবাদী পরিকল্পনা ভবিষ্যদ্‌বাণী নয়। পরিকল্পিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় সমূহ প্রাপ্তব্য উপকরণ, শ্রমিকসংখ্যা ও অর্থনৈতিক বিকাশের প্রয়োজনীয় অন্য উপকরণের হিসেব রাখতে হয়। অর্থনৈতিক অবস্থার মূল্যায়নকালে এই পরিকল্পনা এই অবস্থাকেই অপরিবর্তিত রাখতে চায় না, তাকে বদলে পুনর্গঠন করতে চায়, নতুন সমাজ নির্মাণের মৌল লক্ষ্য অনুসারে অর্থনৈতিক বিকাশ ঘটাতে চায়। সমাজবাদী পরিকল্পনাকে তাই সক্রিয় ও উদ্দেশ্যনির্ভর বলে বর্ণনা করা যায়।

সমাজবাদী বিপ্লব সাধিত হলেই পরিকল্পনা অর্থনৈতিক বিকাশের ভিত্তি হয়ে দাঁড়ায়। নিয়মরহিত চাহিদা যোগান, দামের অনিয়ন্ত্রিত হ্রাস-বৃদ্ধি এবং ক্রেতা বিক্রেতার প্রতিযোগিতায় প্রতিষ্ঠিত বাজার আর সামগ্রিকভাবে অর্থনৈতিক বিকাশে নিয়ামক ভূমিকা পালন করে না। কিন্তু বাজার টিঁকে থাকে, পরিকল্পনাকে সঙ্গে সঙ্গেই বা বিনা বাধায় নিয়ন্তার ভূমিকা গ্রহণ করতে দেয় না।

অ-সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতির সকল ধারাতেই মালিকেরা অর্থ-নৈতিক ব্যবস্থার পরিচালক, এবং উৎপন্ন দ্রব্য বাজারে যায়। বিভিন্ন উৎপাদকের মধ্যে যোগাযোগের অন্য কোন ক্ষেত্র বর্তমান না থাকায় বাজারেই রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের সঙ্গে অন্য ক্ষেত্রের যোগাযোগ ঘটে। উৎপন্ন

দ্রব্যের বিনিময়ের জন্য তাদের দরকার পড়ে এক অর্থনৈতিক যোগসূত্রের। কারণ এই যোগসূত্র ছাড়া রূপান্তরকালীন অর্থনীতি গড়ে তোলা যায় না। উৎপন্ন দ্রব্যের বিনিময়ের মধ্য দিয়েই শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকসম্প্রদায়ের মধ্যে একমাত্র সম্ভবপর যোগাযোগ ঘটে, ও সেই যোগাযোগ থেকেই তাদের অর্থনৈতিক সংহতি গড়ে ওঠে। বাণিজ্যের মধ্য দিয়ে উৎপন্ন দ্রব্যের বিনিময় অন্যসব অরাষ্ট্রিক অসমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ বিস্তারের অন্যতম পন্থা রূপে অপরিহার্য। অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যখন সরকারি মালিকানা, অর্থাৎ জনসাধারণ ও সমবায়ের পরিচালনায় চলে, কেবল তখনই নির্দিষ্ট লক্ষ্যসাধনে প্রত্যক্ষ অর্থনৈতিক পরিকল্পনা সম্ভব। ব্যক্তি উৎপাদকদের পরিচালনাধীন থাকলে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পরিকল্পনা করা যায় না। আমাদের মনে রাখতে হবে যে অধিকাংশ দেশেই সমাজবাদী নির্মাণ কর্মের প্রথম পর্বে খুদে ব্যক্তিগত অর্থনীতি ব্যবস্থারই প্রাধান্য থাকে। সরকারি পরিকল্পনানুসারে এই অর্থনীতিব্যবস্থাকে বাজারের মধ্য দিয়েই চালিত করা হয়, উৎপন্ন দ্রব্যের সংগঠিত ক্রয়, রাষ্ট্রনির্ধারিত ক্রয়মূল্য, ঋণ ও বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য পন্থার সাহায্য নেওয়া হয়।

এইভাবেই বিপ্লব সমাধা হবার সঙ্গে সঙ্গেই নতুন সরকার এক অত্যন্ত জটিল দ্বিমুখী সমস্যার সম্মুখীন হয়; বাজার দখল করা, অর্থাৎ বাজারকে নিজেদের পরিকল্পনার অধিগত করে তাকে সংগঠিত করা এবং অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মধ্যে মূল্য, অর্থ, মুনাফা এবং অন্যান্য ধরনের অর্থনৈতিক সম্পর্কসহ পণ্য উৎপাদন ও বাজারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল কিছুই যুক্তিসংগতভাবে কাজে লাগানো। উদাহরণত রাশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি অক্টোবর বিপ্লবের পূর্বাহ্নে প্রচারিত অর্থনৈতিক কর্মসূচীতে দ্বিধাহীনভাবে ঘোষণা করে যে বিপ্লবের পরেও বাণিজ্য ও অর্থের অস্তিত্ব থাকবে শুধু তার নিয়ন্ত্রণ থাকবে নতুন শ্রমিক সরকারের

হাতে। বুর্জোয়াদের প্রতিষ্ঠিত অর্থ ও বাণিজ্য সংগঠনগুলি (ব্যাঙ্ক, ঋণ ও জীবনবীমা প্রতিষ্ঠান, ক্রেতা ও বাজার সমবায়) বিপ্লবের পরেও থেকে যাবে। বাজারের উপর অধিকার বিস্তার, অর্থাৎ পুরনো ধরনের বাণিজ্যের জায়গায় নতুন সমাজতান্ত্রিক বাণিজ্য ব্যবস্থা নির্ভর করে শিল্পবিকাশের স্তর, বর্তমান বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলির সংখ্যা ও আয়তন এবং দেশের মধ্যে তার বন্টন এবং নতুন বাণিজ্য ব্যবস্থার উপযোগি (উপকরণ, বাড়িঘর এবং সং-প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মী) উপর।

বিপ্লবের প্রথম পর্বে ব্যাঙ্ক, সিণ্ডিকেট ও অন্যান্য বৃহদায়তন পুঁজিতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের জাতীয়করণ দ্বারা বৃহদায়তন পাইকারী ব্যবসায় দখল করেই প্রধানত বাজারের উপর অধিকার বিস্তার সম্ভব হয়। পুঁজিবাদী প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীরা ও গণতান্ত্রিক পন্থায় নির্বাচিত খাদ্য কমিশনগুলি বাণিজ্যে শ্রমিকদের অধিকার কায়েম করে। বৃহত্তর পুঁজিতান্ত্রিক খুচরা বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলির জাতীয়করণ ও মিউনিসিপাল কর্তৃত্বাধীনে আনাই ছিল পরবর্তী পদক্ষেপ। নীতি হিসেবে পুঁজিপতিরা শ্রমিকদের কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে অন্তর্ঘাতী কার্যকলাপ চালালে এবং অবশ্য প্রয়োজনীয় পণ্যের দাম ও বিক্রয়ের কোটা সম্পর্কে সোভিয়েত সরকারের নির্দেশ প্রতিরোধ করলেই এই পন্থা গ্রহণ করা হত।

জাতীয়কৃত ও মিউনিসিপাল কর্তৃত্বাধীন বাণিজ্য সংগঠনগুলিই নতুন রাষ্ট্রিক বাণিজ্য ব্যবস্থার ভিত্তি হয়ে দাঁড়ায়।

কিন্তু রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যের অংশ, বিশেষত খুচরা ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে, এমন বেশি ছিল না যাতে সমগ্র জনমণ্ডলীর প্রয়োজনীয় দ্রব্যের সরবরাহ নিশ্চিত হতে পারে। সেইজন্যই বিপ্লবের পূর্বে প্রতিষ্ঠিত ক্রেতাসমবায়ের পুরনো বাণিজ্যব্যবস্থা ব্যবহার করা আবশ্যিক হয়ে পড়ল।

সমবায়গুলি এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উত্তরাধিকার এবং সেগুলির পূর্ণ

সুযোগ গ্রহণ করা উচিত। রাশিয়ায় সাধারণের এবং শ্রমিকদের ক্রেতা সমবায় ছিল। সাধারণের ক্রেতাসমবায়গুলি যদিও বুর্জোয়াশ্রেণীরই হাতে ছিল, ১৯১৮ সালের এপ্রিলে তাদের সঙ্গে এক চুক্তি স্বাক্ষর করে এই ব্যবস্থা বজায় রাখা হয়; এই ব্যবস্থা বজায় না রাখা গেলে সমাজ-তন্ত্রের প্রতিষ্ঠা সম্ভবই হত না।

সোভিয়েত ইউনিয়নে ক্রেতাসমবায় নতুন বাণিজ্যব্যবস্থা সংগঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। পাইকারী ব্যবসায়ে ক্রেতাসমবায় ও রাষ্ট্র যেমন মুখ্য ভূমিকা পালন করে, তেমনিই খুচরা ব্যবসায়ে বিপ্লব-পরবর্তী প্রথম কয়েক বছরে ব্যক্তিগত পুঁজি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে খুচরা ব্যবসায় থেকে ব্যক্তিগত মালিকানার উৎখাত
(রাষ্ট্রায়ত্ত, সমবায়িক ও ব্যক্তিগত মালিকানাধীন ব্যবসায়ের শতকরা হিসাব)

	১৯২৪	১৯২৮	১৯৩০	১৯৩১
রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যবসায়	১৬·৫	১৬·২	২২·৩	২৬·০
সমবায়িক ব্যবসায়	৩০·৮	৬০·২	৭২·১	৭৪·০
ব্যক্তিগত মালিকানা	৫২·৭	২৩·৬	৫·৬	—

সমাজতান্ত্রিক নির্মাণপর্বে শিল্প, পরিবহণ ও বৃহদায়তন পাইকারী বাণিজ্যের বিকাশের জন্য রাষ্ট্র প্রচুর অর্থ মঞ্জুর করে। খুচরা ব্যবসায়ের বিকাশ ঘটে প্রধানত সমবায়ের মধ্য দিয়ে; জনগণের সাহায্যে লালিত গণসংগঠনরূপে এই সমবায়গুলি গড়ে ওঠে।

সমাজতন্ত্রের জয়লাভের পর গ্রামাঞ্চলের মানুষকে ভোগ্য পণ্য ও

গৃহনির্মাণোপকরণ সরবরাহ এবং বহু কৃষিজ দ্রব্যের ক্রয় ও প্রসেসিং-এ সাহায্য করার জন্য ক্রেতা সমবায়গুলি থেকে গেল।

১৯৬২ সালে ক্রেতাসমবায়গুলির মোট লেনদেন ছিল সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের সমগ্র খুঁচরা ব্যবসায়ের এক-তৃতীয়াংশ।

এইভাবেই সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্য (আদিতে জাতীয়কৃত পুঁজিতান্ত্রিক বাণিজ্যসংগঠনের ভিত্তিতে) এবং বিপ্লবের পূর্বেই প্রতিষ্ঠিত ও নতুন অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার উদ্দেশ্য ও সারবস্তুতে রূপান্তরিত সমবায়িক বাণিজ্যের মধ্য দিয়ে নতুন বাণিজ্য ব্যবস্থার পত্তন হয়। রাষ্ট্রায়ত্ত ও সমবায়িক বাণিজ্য উভয়ই সহজ শর্তের ঋণ, অর্থসাহায্য ও অন্যান্য ধরনের অর্থনৈতিক সাহায্যের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ সাহায্যেই বিকাশলাভ করেছিল।

উৎপাদনের বিকাশ, নতুন বাণিজ্য ব্যবস্থার পত্তন ও কর্মি প্রশিক্ষণের সঙ্গে সঙ্গেই বাজারের উপর কর্তৃত্বও ক্রমে ক্রমে প্রতিষ্ঠিত হয়। অল্প দামে জিনিস বিক্রি করে, বাণিজ্যব্যয় হ্রাস করে, উন্নততর মানের দ্রব্যের বিচিত্রতর সম্ভার উপস্থিত করে এবং বাণিজ্যের সামগ্রিক লেনদেন হ্রাস না করে-ই সমাজতান্ত্রিক বাণিজ্যের প্রসার ঘটিয়ে অর্থনৈতিক চাপ সৃষ্টি মারফৎ বাণিজ্যক্ষেত্র থেকে ব্যক্তিগত মালিকানাকে হটিয়ে দেওয়া হয়।

কৃষিজ দ্রব্যের রাষ্ট্রিক ও সমবায়িক "প্রকিওরমেণ্ট" বাজারে কর্তৃত্ব বিস্তারের অন্যতম মুখ্য শর্ত। শহর ও গ্রামের মধ্যে সংগঠিত বাণিজ্য বিনিময় দ্বিমুখী লক্ষ্যসাধন করে; প্রথমত নগরবাসীদের প্রয়োজনস্বরূপ দ্রব্য রাষ্ট্র কর্তৃক ক্রয় ও সরবরাহ, শিল্পে কাঁচা মাল সরবরাহ এবং বিনিময়ে প্রয়োজনীয় পণ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে রপ্তানী বাণিজ্যের প্রসার ঘটায়: দ্বিতীয়ত সমাজবাদের স্বার্থে শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকসম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক ঐক্য সংহত করে।

নির্দিষ্ট মূল্যে রাষ্ট্র কর্তৃক কৃষিজ দ্রব্যের "প্রকিওরমেন্ট' সমাজতন্ত্রের দিকে খুদে কৃষকের উপর নির্ভরশীল অর্থনৈতিক ব্যবস্থার রূপান্তর পরিকল্পনার বলিষ্ঠ হাতিয়ার। রাষ্ট্র যদি কৃষকদের সম্পর্কে সঠিক অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ গ্রহণ করে, তবে রাষ্ট্র দ্রুত কৃষিজ দ্রব্যের পরিকল্পনানুগ 'প্রকিওরমেন্ট'এর ব্যবস্থা করবে, এবং যথেষ্ট পরিমাণ পণ্য আয়ত্তে এনে বাজারে প্রধান ভূমিকা নেবে, বাজারের উপর কর্তৃত্ব করবে। উদাহরণত ১৯২৬-'২৭ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নে যখন আড়াই কোটি ছোট খামার বর্তমান এবং খাদ্য সংগৃহীত হত কেবলমাত্র কৃষকদের স্বাধীন স্বেচ্ছাকৃত বিক্রয় থেকে, তখন রাষ্ট্রীয় ও সমবায় সংগঠনগুলির 'প্রকিওরমেন্ট' মারফৎ গ্রাম থেকে শহরে আনীত শস্যের শতকরা ৭৫ ভাগেরও বেশি সংগৃহীত হত। রাশিয়ায় গম চিরকালই প্রধান ফসল, এবং অন্য অনেক শস্যেরই বাজারদর নির্ভর করত গমের দামের উপর।

পরিকল্পনানুসারে যে দামে কৃষিজ পণ্য সংগৃহীত হয়, বাজার দখল করায় ও সমাজতন্ত্র নির্মাণে তার বিপুল অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক গুরুত্ব আছে। এই দামে কৃষকদের ও সমাজতন্ত্রের দিকে অগ্রসরমাণ সমগ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পোষানো উচিত। দেখতে হবে এই দামে যাতে কৃষকদের অর্থনৈতিক উদ্যোগ বৃদ্ধি পায় এবং তাঁরা উৎপাদন বৃদ্ধি করার ও শ্রমের উৎপাদনক্ষমতা বাড়াতে উৎসাহিত বোধ করেন। এই দামে রাষ্ট্রেরও যাতে সুবিধা থাকে তা-ও দেখতে হবে, অর্থাৎ রাষ্ট্র মেহনতি মানুষের সংগতির অনুরূপ দামে শহরের মানুষকে যেন খাদ্য যোগাতে পারে, অথচ কৃষকসমাজ সহ সমগ্র জনমণ্ডলীর জীবনমানের উন্নতিকল্পে কারখানা নির্মাণে বিনিয়োগার্থ খানিকটা মুনাফাও রাখতে পারে।

রাষ্ট্রায়ত্ত ও সমবায় বাণিজ্যের (শাকসবজির গুদাম, মাংস-প্যাকিং

যুক্ত, রেফ্রিজেরেটর প্লান্ট, ইত্যাদি) বৈষয়িক ও কৃৎকৌশলগত বিকাশের স্তর যথেষ্ট উন্নত না হওয়ায় এবং মাংস, মাখন ও দুধের পরিমাণ চাহিদামাফিক না হওয়ায় সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে আজও এমন যৌথখামারী বাজার আছে যেখানে যৌথখামারীরা তাঁদের ব্যক্তিগত খামারের উৎপন্ন দ্রব্য এবং যৌথ খামারের সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি-ব্যবস্থা থেকে প্রাপ্ত সম্পদের অংশবিশেষ বিক্রয় করেন। এই সব বাজারে দাম, রাষ্ট্র যে দামে যৌথ খামার থেকে উৎপন্ন দ্রব্য কেনে তার থেকে বেশি। রাষ্ট্র কিনে নেবার পর যা বাকি থাকে, তা যৌথ খামারের পক্ষ থেকে সরাসরি বাজারে বেচে দেওয়া হয়। ১৯৬২ সালে কৃষিজ দ্রব্যের বিক্রয়ের ক্ষেত্রে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের মোট খুচরা বাণিজ্যের প্রায় শতকরা ১৩ ভাগ হয়েছিল যৌথ খামার মারফত।

সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে যে এখনও এমন যৌথখামারী বাজার রয়ে গেছে যেখানে পণ্য সরবরাহ ও দাম রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনামতে স্থির হয় না, তা থেকেই প্রমাণ হয় যে বাজারের উপর পরিকল্পনানুগ কর্তৃত্ব কায়েম এখনও সম্পূর্ণ হয় নি। উৎপাদন শক্তিসমূহের আরো বিকাশ, উৎপাদন বৃদ্ধি এবং সমাজতান্ত্রিক বাণিজ্যের বৈষয়িক ও কৃৎকৌশলগত ভিত্তির প্রসার ও উন্নতি ঘটলে এই কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা সম্পূর্ণ হবে।

দেখা যাচ্ছে অর্থনীতিব্যবস্থার অন্যান্য শাখার মতই বাজারের উপর পরিকল্পনানুগ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা এক বিষয়গত প্রক্রিয়া। উৎপাদনের স্তর এবং বিশাল ও যুক্তিসংগতভাবে বিস্তীর্ণ বাণিজ্যব্যবস্থা ও প্রয়োজনানুরূপ গুদাম ও দোকানপাটের অস্তিত্বের উপরই এই প্রক্রিয়ার সাফল্য নির্ভর করে। যৌথ নেতৃত্বের বলেই সরকার নতুন বাণিজ্যের বিকাশ স্বচ্ছন্দ ও দ্রুত করে তুলতে পারে। কিন্তু যতদিন না উপযুক্ত অর্থনৈতিক পরিবেশ প্রতিষ্ঠিত হয়, ততদিন প্রশাসনিক নির্দেশে এই বাণিজ্য চালু করে দেওয়া যায় না।

যেসব কৃষিনির্ভর দেশে শিল্প যথেষ্ট অগ্রসর নয়, জনমণ্ডলী প্রধানত কৃষকসম্প্রদায়ভুক্ত, সেখানে খাদ্যের সস্তা দর এবং শিল্পদ্রব্যের উঁচু দর বেঁধে দিয়ে সরকার শিল্পবিকাশের দ্রুত ও আরো বেশি পন্থা কার্যকর করতে প্রলুব্ধ হতে পারে। কিন্তু কৃষক অর্থনীতিব্যবস্থা থেকে শিল্পে সুযোগসুবিধা অতিরিক্ত হারে সরাতে গেলে কৃষকদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিতে পারে এবং সরকার ও খুদে উৎপাদকদের মধ্যে রাজনৈতিক বিভেদ আসতে পারে। কৃষিজ দ্রব্য কেনার দাম অতিরিক্ত কম হলে কৃষি অর্থনীতি দুর্বল হয়ে পড়তে পারে। এতে শিল্পেরও কাঁচা মালের ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়তে পারে, রপ্তানী বাণিজ্য বিপদাপন্ন হতে পারে, এবং যেহেতু কৃষকেরাই মুখ্য ক্রেতা, সেইহেতু শিল্পদ্রব্যের আভ্যন্তরিক বাজারও সংকীর্ণ হয়ে পড়তে পারে। অর্থাৎ সমগ্র অর্থনীতিব্যবস্থার ভারসাম্য বিনষ্ট হয়ে পড়তে পারে। অন্যদিকে আবার শিল্পবিকাশের জন্য গ্রামাঞ্চল থেকে রসদ সংগ্রহ একেবারে বন্ধ করে দিলে চলবে না, কারণ তাতে দেশের শিল্পায়ন ক্ষুণ্ণ হবে, অর্থনৈতিক অগ্রগতির হার নেমে যাবে।

টাকার ক্রয়ক্ষমতার স্থিতিশীলতা সামগ্রিকভাবে কোন দেশের এবং বিশেষত গ্রাম-শহরের মধ্যে পণ্য বিলিব্যবস্থার অর্থনীতিগতভাবে সুষ্ঠু ব্যবস্থার প্রমাণ। টাকা যেহেতু মূল্য অর্থাৎ দ্রব্যোৎপাদনে ব্যয়িত সামাজিক শ্রমের মূল্যের সর্বজনীন পরিমাণ, সেইহেতু টাকার পরিমাণ ও উৎপন্নদ্রব্যের পরিমাণ ও তার বিলি হয়ে যাবার গতির মধ্যে সংগতি থাকলেই টাকার দাম স্থির থাকে। টাকার মূল্যের স্থিতিশীলতা স্টক এবং সোনা ও বৈদেশিক মুদ্রা তহবিলের উপর নির্ভর করে।

রাশিয়ায় ১৯১৪ ১৮ সালের প্রথম মহাযুদ্ধ, ও বৈদেশিক হস্তক্ষেপের ফলে এক ভয়ংকর মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। তাতে দেশের পুনর্বাসন ও অর্থনৈতিক বিকাশ ক্ষুণ্ণ হয়। সোনা ও পণ্য মূল্যের উপর ভর করে

নতুন টাকা বাজারে ছাড়তে হয়। এই অর্থসংস্কারে দু'বছর লাগে, ১৯২৪ সালে এই সংস্কার কর্ম সমাধা হয়। নতুন রুবল-এর দাম হল ০·৭৭৪২৩৪ গ্রাম খাঁটি সোনা, অর্থাৎ দামের দিক থেকে প্রাক্‌বিপ্লব রুবল-এরই সমান। নতুন রুবল-এর ক্রয়ক্ষমতা ক্রমে বাড়তে থাকে, কিন্তু পরে দ্রুত শিল্পায়নের পর্বে ও বিশেষত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে উৎপন্ন পণ্যের পরিমাণের তুলনায় টাকার পরিমাণ দ্রুত বেড়ে যায়। ১৯৫০ সালে রুবল-এর দাম দাঁড়ায় ০·২২২১৬৮ গ্রাম খাঁটি সোনা। জাতীয় অর্থনীতি ব্যবস্থার পরবর্তী বিকাশ, উৎপাদন বৃদ্ধি ও মূল্যহ্রাসের ফলে ১৯৬১ সালের জানুয়ারি রুবল-এর দাম বেড়ে দাঁড়াল ০·৯৮৭৪১২ গ্রাম খাঁটি সোনা।

এইভাবেই দেখা যায় যে অর্থব্যবস্থার স্থিতিশীলতা উৎপাদনের স্বাভাবিক বিকাশ ও পণ্যবিলির ফলস্বরূপ। এই স্থিতিশীলতা থেকেই আবার শিল্প ও বাণিজ্যের বিকাশ উন্নত হয়, জনমণ্ডলীর কাছে পণ্যের যোগান বাড়ে এবং শ্রমের উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ে। জনসাধারণ উপার্জিত অর্থ দিয়ে প্রয়োজনীয় পণ্যসমূহ না কিনতে পারলে টাকা উৎপাদনে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে না।

বিপ্লবের পর যেসব দেশ সমাজতান্ত্রিক পথ গ্রহণ করেছে, সেই সব দেশেই অর্থনৈতিক পুনঃসংগঠন ও বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই টাকার মূল্যের স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করার জন্য অর্থসংস্কার সম্পন্ন হয়। এ ধরনের কোন সংস্কার ছাড়া পরিকল্পনানুগ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা অসম্ভব। অর্থনীতি ব্যবস্থার পরিকল্পনানির্ভরতা এবং শিল্পজ ও কৃষিজ উৎপাদন ও পণ্যবিলির অব্যাহত বিস্তারেই নতুন সমাজের অর্থব্যবস্থার স্থিতিশীলতা নিশ্চিত হয়। সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি ব্যবস্থায় টাকাই নতুন উৎপাদন সম্পর্ক প্রকাশ করে এবং অর্থনীতি ব্যবস্থার পরিকল্পনানুগ ব্যবস্থাপনার বাহন রূপে রাষ্ট্র তা ব্যবহার করে।

অধিকাংশ বিকাশশীল দেশেই টাকার মূল্য বাড়াবার দিকে লক্ষ্য রেখে এবং সাম্রাজ্যবাদ থেকে যথার্থ স্বাধীনতা লাভের সংগ্রামে টাকার ভূমিকা বৃদ্ধি করার সংকল্প নিয়ে অর্থ সংস্কার সমাধা করা হয়েছে।

অর্থসংস্কারের মূল্যায়ন প্রসঙ্গে বলা যায় যে জাতীয় মুদ্রাব্যবস্থার পত্তন দেশের ঔপনিবেশিক শাসনমুক্তির পরিমাপ। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে জাতীয় মুদ্রাব্যবস্থাই অর্থনৈতিক পরিকল্পনার হাতিয়ার হওয়া উচিত।

এইভাবেই বিকাশশীল দেশগুলিতে অর্থসংস্কার অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিকল্পনানুগ ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। টাকার মূল্য স্থির রেখে তার পরিকল্পনা সম্মত ব্যবহার করতে পারলে আভ্যন্তরিক বাজার দখল করতে সুবিধা হয়।

যেসব দেশ পূর্বে উপনিবেশ ছিল এবং যেসব দেশে বিপ্লবের আগেই পুঁজিতান্ত্রিক বিকাশের যথেষ্ট অগ্রগতি ঘটেছে, এই দুই ধরনের দেশে বাজারে পরিকল্পনানুগ কর্তৃত্ব লাভের পন্থা ভিন্ন। নতুন জাতীয় রাষ্ট্রে প্রথমেই বহির্দেশীয় বাণিজ্য (যার অধিকাংশই চলে পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে) পরিকল্পনানুগ কর্তৃত্বাধীনে নিয়ে আসা বাঞ্ছনীয়। আফ্রিকান দেশগুলির আমদানী ও রপ্তানী বাণিজ্যের শতকরা ৮০ ভাগেরও বেশি চলে পশ্চিম ইয়োরোপ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহ ও অনগ্রসর এশীয় দেশগুলির সঙ্গে বাণিজ্য তাঁদের বৈদেশিক বাণিজ্যের এক পঞ্চমাংশ মাত্র।

সমগ্র অর্থনীতির ক্ষেত্রে যেমন, তেমনিই বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও মনে রাখা দরকার যে পরিকল্পিত পরিচালন ব্যবস্থার মজবুত অর্থনৈতিক ভিত্তি থাকা উচিত। উদাহরণত বৈদেশিক বাণিজ্যের নিয়ন্ত্রণের উপর রাষ্ট্রায়ত্ত একচেটিয়া মালিকানা কায়েম সাম্রাজ্যবাদীদের হাত থেকে যথার্থ স্বাধীনতা ছিনিয়ে নেওয়ার সংগ্রামে শুধু প্রয়োজনীয়

পন্থাই নয়, অপরিহার্য পন্থাবিশেষ। কিন্তু বৈদেশিক বাণিজ্যের ব্যবস্থা আরো সুপরিকল্পিত করতে গেলে সমগ্র অর্থনীতির রূপই ক্রমে ক্রমে পরিবর্তন করতে হবে। বহু ক্ষেত্রে বিস্তৃত এক কৃষি ব্যবস্থার উন্নতি ঘটাতে হবে এবং এমন এক জাতীয় শিল্পব্যবস্থা গড়ে তুললে হবে যাতে বৈদেশিক বাণিজ্য প্রসার লাভ করবে ও আরো মুনাফা যোগাবে।

নতুন জাতীয় রাষ্ট্রগুলি তাদের অন্তর্দেশীয় বাণিজ্যেও যে অসুবিধার সম্মুখীন হয়, তা-ও কিছু কম নয় এবং তারও বিশেষ লক্ষণ আছে। এই দেশগুলির সামনে দায়িত্ব শুধু অন্তর্দেশীয় বাজারের উপর পরিকল্পনানুগ কর্তৃত্ব স্থাপনই নয়, তার বিকাশও পরিকল্পনা মতে সংগঠিত করা।

ইয়োরোপে পণ্য-অর্থ সম্পর্কাবলী থেকে পুঁজিতন্ত্র বিকাশ লাভ করেছিল, কিন্তু আফ্রিকায় বিশ্ব পুঁজিতান্ত্রিক বাজারের আওতায় এই সম্পর্কগুলি রূপ পরিগ্রহ করেছিল। দীর্ঘকাল ধরেই বিদেশী পুঁজিপতিদের দ্বারা আফ্রিকান জনসাধারণকে যেভাবে শোষণ করা হয়েছে, তাকে অর্থনীতি বহির্ভূত বাধ্যকরণ বলে বর্ণনা করা যায়। উৎপাদিকা শক্তিসমূহের স্তর ও সামাজিক শ্রম বণ্টনের মানের যথোপযুক্ত উন্নতি ঘটাবার আগেই আফ্রিকান জাতিসমূহকে অর্থ সম্পর্কের ব্যবস্থায় প্রবেশ করতে বাধ্য করা হয়। তাঁরা নিজেরা তাঁদের জাতীয় অর্থনীতি থেকে বিচ্যুত হন না। বিশেষ বিশেষ শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি ও পৃথিবীর বাজারে রপ্তানী বৃদ্ধির সঙ্গে অন্তর্দেশীয় বাণিজ্য সেই অনুপাতে দ্রুত বিস্তার লাভ করে না। উদাহরণত ক্রান্তীয় আফ্রিকায় বৃটিশ উপনিবেশগুলিতে আফ্রি-কানদের কার্যত জমির শতকরা ৭০ ভাগ ও শ্রমিক সংখ্যার শতকরা ৬০ ভাগ কৃষি অর্থনীতির অন্তর্গত ছিল। কিন্তু মাথা পিছু ধার্য কর দেবার উপযুক্ত অর্থের জন্য আফ্রিকান জনসাধারণ বাগিচা ও খনিতে চাকরি নিতে বাধ্য হন। এই পরিস্থিতিতে অর্থ সম্পর্ক পণ্য উৎপাদন

ও অন্তর্দেশীয় বাজারের তুলনায় অনেক দ্রুত বিস্তার লাভ করে। ফলে পণ্য উৎপাদন ও অন্তর্দেশীয় বাজারের পশ্চাৎপদতা হেতু নতুন জাতীয় রাষ্ট্রগুলির দায়িত্ব দুরূহতর হয়ে ওঠে।

পশ্চিমী শক্তিসমূহ তাদের প্রাক্তন উপনিবেশগুলিতে তাদের অর্থনৈতিক কর্তৃত্ব বজায় রাখতে কৃতসংকল্প এবং তদুদ্দেশ্যে তারা চাপ দিচ্ছে যাতে নতুন রাষ্ট্রগুলি স্বাধীন বাণিজ্যকে পূর্ণ সুযোগ দেয়, তাকে পরিকল্পনা দিয়ে বাঁধবার চেষ্টা না করে। কিন্তু মুক্ত বাণিজ্য মানেই পুঁজিতান্ত্রিক বিকাশ, এবং তার সঙ্গে ঔপনিবেশিক নির্ভরতার কালে জনগণ যা যথেষ্ট ভোগ করেছে সেই প্রতিযোগিতা, শোষণ এবং আনুষঙ্গিক সমূহ "আশীর্বাদ"।

অর্থনৈতিক পরিচালনব্যবস্থা পরিকল্পনা এবং তারই সঙ্গে পণ্য উৎপাদন ও অন্তর্দেশীয় বাজারের বিকাশসাধন অত্যন্ত দুরূহ দায়িত্ব। এই দায়িত্ব পালনে যা দরকার, তা শুধু বৈপ্লবিক সংকল্প নয়, দূরদৃষ্টি ও যুক্তিনির্ভর অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ। তবুও এই দায়িত্ব সাধন সম্ভবপর।

পরিকল্পনা, বাজার, বাজারের পরিকল্পনানুগ নিয়ন্ত্রণ এবং সমগ্র অর্থনীতির বিকাশের স্বার্থে তার ব্যবহার সবচেয়ে বিকশিত পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলিতেও অর্জন করা যায় না, অথচ সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকর্মের পথে অগ্রসরমান সকল দেশেই তা বাস্তবসম্মত ও সম্ভবপর বলে প্রমাণিত হয়।

৭। সমাজতন্ত্র ও শ্রম

পুরাণো ব্যবস্থাকে বাতিল করে তার জায়গায় নতুন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে গেলে শ্রমিকের উৎপাদন ক্ষমতার স্তরোন্নয়ন আবশ্যক। স্বভাবতই শ্রমিকদের সংখ্যা বাড়িয়ে উৎপাদন বৃদ্ধি করা যায়। পুঁজি-

তান্ত্রিক ব্যবস্থায় কর্মঠ জনসমষ্টির একাংশ কোন কাজ করে না, কারণ সমাজ তাদের চাকরি যোগাতে পারে না। আরেক অংশ কাজ করে না, কারণ তাদের টাকা আছে বলেই তারা নির্বিত্তদের শ্রমের ফল শোষণ করে। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সকল কর্মঠ লোকই কাজ করতে পারে, তাদের কাজ করতে হবেই। এতে চাকরিজীবীর সংখ্যা বাড়বে, উৎপাদনও বাড়বে। কিন্তু উৎপাদনবৃদ্ধির এই উৎস অফুরান নয়।

লোকায়ত্ত সরকার প্রতিষ্ঠার পরই প্রথম পর্যায়েই দেশের মধ্যে পরজীবী শোষণমূলক সম্ভোগ বন্ধ করে এবং মুনাফার রপ্তানী নিরোধ করে জীবনমানের খানিকটা উন্নতি সাধন করা যায়। কিন্তু এই উৎসও আরো স্বল্পস্থায়ী। জীবনমান উন্নতির একমাত্র স্থিতিশীল ও স্থায়ী পন্থা শ্রমিকের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি। তাই চূড়ান্ত বিচারে পুরাণো ব্যবস্থার জায়গায় নতুন ব্যবস্থার পত্তন নির্ভর করে সামাজিক শ্রমের উৎপাদন ক্ষমতার মানের উপর।

শ্রমিকের উৎপাদন ক্ষমতার উচ্চতর স্তরে পৌছনোয় পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থার তুলনায় সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার সুবিধাগুলি ও তার লক্ষণসমূহ অল্প কথায় বিচার করে দেখা যাক। প্রথমত উৎপাদকেরাই উৎপাদনের উপায়সমূহের যৌথ মালিক হয়ে দাঁড়াল এবং তার দ্বারা উৎপন্ন যাবতীয় বৈষয়িক সম্পদেরও মালিক হল। মানুষ যখন নিজের জন্য কাজ করে, নিজের সমাজের কল্যাণের জন্য কাজ করে, শোষকদের জন্য নয়, তখন শ্রমের প্রতি তাদের মনোভাব বদলে যায় এবং তারা নিজেদের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির প্রণোদনা লাভ করে। দ্বিতীয়ত সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি পরিকল্পনামতে বিকাশ লাভ করে, তাকে সংকট ও আনুষঙ্গিক ক্ষতি স্বীকারের মধ্য দিয়ে যেতে হয় না। তৃতীয়ত সমাজতান্ত্রিক সমাজে নতুন যন্ত্রপাতির প্রয়োগে কাজ সহজ হয়, বেকারী দেখা দেয় না। ফলে শ্রমজীবী জনতা যন্ত্রায়নে উৎসাহ বোধ করেন এবং তাঁদের

অনেকেই নতুন আবিষ্কার বা কর্মক্ষমতা বৃদ্ধির পন্থা নির্দেশ করেন। চতুর্থত সমাজতান্ত্রিক সমাজে যেহেতু কোন ব্যক্তিগত নিয়োগকর্তা নেই, প্রতিযোগিতা নেই, সেইহেতু প্রত্যেক কারখানা মালিককে অতি সাবধানে রক্ষা করতে হবে এমন কোন গোপন শিল্পতথ্য নেই। প্রত্যেক উদ্ভাবন, প্রত্যেক নতুন যন্ত্র ও কাজ বা শ্রমসংগঠনের প্রত্যেকটি নতুন ও আরো যুক্তিসম্মত পন্থা ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয় এবং সমগ্র অর্থনীতিব্যবস্থায় প্রযুক্ত হয়। একসঙ্গে ধরলে সমাজতন্ত্রের এই সমস্ত সুবিধা উৎপাদিকা শক্তিসমূহের এবং সামাজিক শ্রমের উৎপাদনক্ষমতার অপরিমেয় বিকাশের সুযোগ উন্মোচিত করে দেয়।

মানবজীবনের চাহিদা থেকে উদ্ভূত শ্রমিকের উৎপাদনক্ষমতা বৃদ্ধির বিষয়গত প্রয়োজন এবং উৎপাদনের সামাজিক পরিবেশে নিহিত তার বিষয়গত সম্ভাবনা শ্রমিকের উৎপাদনক্ষমতার অব্যাহত বিকাশকে সমাজতন্ত্রের অভিন্ন লক্ষণে পরিণত করে।

সমগ্র অর্থনীতির শ্রমিক উৎপাদনক্ষমতার উন্নতিসাধনে ধাতুবিদ্যাগত, ইনজিনীয়ারিং, রাসায়নিক ও শক্তি-উৎপাদন শিল্পগুলি নিয়ামক গুরুত্বের অধিকারী, কারণ এইসব শিল্পই মানুষকে আধুনিক অত্যুচ্চ-উৎপাদী শ্রমোপকরণ যোগায়।

কিন্তু যন্ত্র যতই ভালো হোক, মানুষ ছাড়া তাদের চালানো যায় না। তাই শ্রমের উৎপাদনক্ষমতা নির্ভর করে তাদেরই উপর যারা যন্ত্র চালাতে প্রশিক্ষণ লাভ করেছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার সর্বাধুনিক সম্পদে বলীয়ান বৃহদায়তন সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনের প্রয়োজন পড়ে দক্ষ শ্রমিক, ইনজিনীয়ার ও কৃৎকুশলীর।

সমাজতন্ত্র নির্মাণকালে এক সাংস্কৃতিক বিপ্লব ঘটে যায়। এই বিপ্লবে পুরাণো ব্যবস্থার উত্তরাধিকার নিরক্ষরতা ও মূর্খতা মুছে যায়। উচ্চতর ও মাধ্যমিক বিশেষীকৃত শিক্ষাসহ শিক্ষা দ্রুত প্রসার লাভ

করতে থাকে। উদাহরণত জারতন্ত্রী রাশিয়ায় জনমণ্ডলীর তিন-চতুর্থাংশ ছিলেন নিরক্ষর, নারীদের মাত্র এক-দশমাংশ ছিলেন সাক্ষর। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে বহুদিন আগেই নিরক্ষরতার বিলোপ ঘটেছে। ১৯১৮ থেকে ১৯৬০ সালের মধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়নের উচ্চশিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলিতে ৪,৮০০,০০০ বিশেষজ্ঞ শিক্ষা লাভ করেন, মাধ্যমিক কৃৎকৌশলশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে ৭,৭০০,০০০ জন স্নাতকরূপে উত্তীর্ণ হন। ১৯৫৯-এর দেশব্যাপী আদমশুমারে দেখা যায় যে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের প্রাপ্তবয়সী জনমণ্ডলীর প্রায় অর্ধেকই হয় উচ্চতর নয়ত অসম্পূর্ণ উচ্চতর, নয়তো মাধ্যমিক কিংবা সপ্তবর্ষ শিক্ষাক্রমে শিক্ষিত।

শ্রমের উৎপাদন ক্ষমতার অব্যাহত উন্নতি অর্জন করতে গেলে সঠিক শ্রম সংগঠনের গুরুত্ব সমধিক। শ্রমের ভিত্তি সকল সময়েই সমাজ-বিন্যাস। মানুষ কি শ্রমোপকরণ ব্যবহার করে এবং এই উপকরণের মালিকানা কার হাতে, তারই প্রভাবে সমাজ বিন্যাসের পরিবর্তন ঘটে। অন্যভাবে বলতে গেলে সমাজবিন্যাস নির্ভর করে উৎপাদিকা শক্তি-সমূহের স্তরের উপর এবং উৎপাদনের উপায় সমূহের মালিকানার ধরনের উপর।

বৈষয়িক সম্পদ সৃষ্টি করতে মানুষ একত্রে কাজ করে। এই সহযোগ বলতে বোঝায় এক ও অভিন্ন বা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহে বহু মানুষের যৌথ সংগঠিত শ্রম। এই সহযোগের বন্ধনসূত্র একক পরিচালন ব্যবস্থা।

সমাজতান্ত্রিক সহযোগের ফলে একই সমাজতান্ত্রিক যূথের অন্তর্গত বিভিন্ন দেশ, অর্থনীতির বিভিন্ন শাখা বা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আরো যথাযথ শ্রমবণ্টন পরিকল্পনা করা যায়, অর্জন করা যায়। শ্রমবণ্টন অর্থাৎ পণ্য বিশেষের উৎপাদনে প্রতিষ্ঠান, অর্থনীতি ব্যবস্থার শাখা-বিশেষ

বা দেশের বিশেষীকরণ (উদাহরণতঃ যন্ত্র, জ্বালানি, বিভিন্ন ধরনের কাঁচা মাল, ইত্যাদি) এবং বিশেষ কোন উপকরণ বা ইউনিটের উৎপাদনে প্রতিষ্ঠান বা অর্থনীতি ব্যবস্থার শাখা বিশেষের মধ্যেই বিশেষীকরণের ফলে উন্নততর মানের পণ্য আরো বেশি পরিমাণে ও আরো সস্তায় উৎপাদন করা সম্ভব হয়। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এহেন শ্রমবণ্টনে পুঁজিতন্ত্রের অনুরূপ একপেশে ও অত্যন্ত সংকীর্ণ বিশেষীকরণ ঘটে না। অনগ্রসর দেশগুলি যতদিন সাম্রাজ্যবাদী শাসনাধীন থাকে ততদিন এই দেশগুলি কেবলমাত্র কাঁচা মালের যোগানদার। এইসব দেশে বিদেশী পুঁজির প্রভাবে শ্রমবণ্টন একক শস্য ফলনের রূপ নেয়— চিনি, কফি, চীনেবাদাম, কোকো বা অন্য কোন শস্যের ফলন দেখা যায়। এই পুঁজিতান্ত্রিক শ্রমবণ্টন নির্ভরশীল দেশগুলিকে বিশাল কৃষিগত উপাঙ্গে পরিণত করে এবং তাদের বিকাশ ব্যাহত করে। দেশের মধ্যে ও আন্তর্জাতিক স্তরে শ্রমের সমাজবাদী সহযোগ থেকে এক নতুন ধরনের শ্রমবণ্টনের সূত্রপাত হয়, যার ফলে বিকাশ দ্রুততর হয়, বৈষয়িক উৎপাদন উন্নত হয়, এবং শ্রমের উৎপাদন ক্ষমতা বেড়ে যায়।

সমাজবাদী শ্রমের সহযোগের অন্যতম লক্ষণ শ্রমিকদের মধ্যে সচেতন শৃঙ্খলা। সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় শ্রমিকশৃঙ্খলা রক্ষিত হয় বলপ্রয়োগের দ্বারা। পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এই শৃঙ্খলা রক্ষিত হয় খাদ্য বন্ধ করে দেবার ভয় দেখিয়ে। সমাজতন্ত্রে শ্রমিকশৃঙ্খলা শ্রমিকেরা নিজেরাই সচেতন প্রয়াসে রক্ষা করেন, কারণ উৎপাদনের অধিকর্তারূপে তাঁরা উৎপাদনের বিকাশে আগ্রহী।

প্রতিষ্ঠান বিশেষে কর্মরত সমগ্র শ্রমিকগোষ্ঠীর সাহায্যপুষ্ট একক ব্যক্তির ব্যবস্থাপনাই সমাজবাদী শ্রমিক সহযোগের অন্যতম লক্ষণ। বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠানের অসংখ্য কর্মিবৃন্দের কাজকে সুসমন্বিত করতে গেলে রাষ্ট্র ও উক্ত প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের কাছে দায়িত্ববদ্ধ একক ব্যক্তির

একক কর্মক্ষম ব্যবস্থাপনাই বাঞ্ছনীয়। কোন প্রতিষ্ঠানের পরিচালক রাষ্ট্রের দায়িত্বসম্পন্ন প্রতিনিধি। তিনি রাষ্ট্রের পক্ষে ও জনগণের স্বার্থে কাজ করে থাকেন। একক ব্যক্তির ব্যবস্থাপনার অর্থই কোন প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনায় সমগ্র কর্মিবৃন্দের যোগদান। এই কর্মিবৃন্দ ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনের মধ্য দিয়ে উৎপাদন পরিকল্পনা রচনায় সাহায্য করেন, পরিকল্পনা কীভাবে রূপায়িত হল, কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে তার বিবরণ শোনেন, এবং প্রতিষ্ঠানের কাজের উন্নতিসাধন সম্পর্কে প্রস্তাব পেশ করেন। যথাযোগ্য ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনের অনুমোদন ছাড়া কর্তৃপক্ষ কোন শ্রমিক বা অন্য কর্মচারীকেও কর্মচ্যুত করতে পারেন না।

সমাজবাদী প্রতিযোগিতা সমাজবাদী শ্রমিক সহযোগের আরেকটি লক্ষণ। বুর্জোয়াশ্রেণী ও তার সমর্থকেরা বলে যে মানুষ কেবল প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়েই তার যোগ্য পরিচয় দিতে পারে। বাস্তবে প্রতিযোগিতা মেহনতি মানুষের বিপুল বৃহদংশের ক্ষমতাকেই দমন করে। প্রতিযোগিতা খুদে উৎপাদকদের বিনাশ করে এবং ক্ষুদ্র এক শোষক গোষ্ঠীকে সমৃদ্ধ করে। এই সংগ্রাম সকলের বিরুদ্ধে সকলের সংগ্রাম। সমাজবাদী প্রতিযোগিতা এক ব্যাপক আন্দোলন। এর মূল বাণী : যারা সম্মুখবর্তী, তাদের অতিক্রম কর, যারা পিছিয়ে আছে তাদের সাহায্য কর, এবং এইভাবে উৎপাদনের সামগ্রিক বিস্তার ঘটাও। এই আন্দোলনের লক্ষ্য পরিকল্পনার লক্ষ্য অতিক্রম, শ্রমের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি, উৎপন্ন পণ্যের মানোন্নতি, ব্যয় সংকোচ, এবং কাচা মাল ও অন্যান্য মাল, জ্বালানি ও বিদ্যুৎশক্তি বাঁচানো। এই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে উৎপাদন ও সমগ্র সমাজের কল্যাণ সাধনের প্রতি জনগণের নতুন কর্তৃত্বমূলক মনোভাবের সৃষ্টি হয়।

উৎপাদনের কৃৎকৌশলগত মান ক্রমান্বয়ে উন্নত হলে সমাজবাদী

শ্রমসংগঠনের এই লক্ষণসমূহ শ্রমের উৎপাদন ক্ষমতার অব্যাহত উন্নতি নিশ্চিত করে। সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজবাদী নির্মাণকর্মের কালে শ্রমের উৎপাদন ক্ষমতা শিল্পে শতকরা ১১০০ ভাগেরও বেশি ও কৃষিতে শতকরা ৪০০ ভাগ বৃদ্ধি পায়।

শ্রমের উৎপাদনক্ষমতা বাড়াতে গেলে শুধু লোকবলের জন্য ব্যয় কমালেই চলবে না, উৎপাদনের প্রতি ইউনিটের বৈষয়িক শ্রমেরও ব্যয় কমাতে হবে। এতে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রত্যেক শ্রমিকের অধিকতর উৎপাদন নিশ্চিত করলেই চলবে না, যন্ত্র, বিদ্যুৎশক্তি, এবং পূর্বে যেসব কাঁচা মাল উৎপাদনে শ্রম ব্যয়িত হয়েছে, তারও আরো সুপরিকল্পিত ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। শ্রমের উৎপাদনক্ষমতা শুধু শিল্পশ্রমিক প্রতি গড়পড়তা উৎপাদনহারের বৃদ্ধিতেই বাড়বে না, সামগ্রিকভাবে কোন প্রতিষ্ঠানে বা অর্থনীতির শাখা বিশেষে শ্রমের উৎপাদনক্ষমতার বৃদ্ধি ঘটাতে হবে। এই লক্ষ্যে পৌছতে গেলে প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে এবং সামগ্রিকভাবে প্রত্যেক শিল্পে শ্রমিক ও অফিস কর্মচারীদের সংখ্যার অনুপাত রক্ষা করতে হবে। ব্যবস্থাপক কর্মীদের সংখ্যা যদি বেশি বেড়ে যায়, তাতে শ্রমিকদের উৎপানক্ষমতা বৃদ্ধি হেতু অর্জিত সম্পদ সম্পূর্ণ ব্যয়িত হয়ে যেতে পারে।

শেষতঃ জনমণ্ডলীর শ্রমজীবী মানুষ প্রতি ও জন প্রতি জাতীয় আয়ের মোট বন্টন থেকে কোন দেশের সামাজিক শ্রমের গড়পড়তা উৎপাদন ক্ষমতার হিসেব পাওয়া যায়। বৈষয়িক উৎপাদনের যে ক্ষেত্রে জাতীয় আয় সৃষ্টি হয় এবং শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য, ব্যবস্থাপনা, প্রভৃতি ক্ষেত্রের মধ্যে শ্রমিককর্মীদের সংখ্যার অর্থনীতিসম্মত যুক্তিসঙ্গত অনুপাত রক্ষা করলে এই হার বাড়ানো যায়। সুযোগ পেলেই যেমন শিক্ষক ও চিকিৎসকের সংখ্যা বাড়িয়ে যাওয়া দরকার, ব্যবস্থাপনায় নিযুক্ত লোকের সংখ্যা তেমনিই সামলে রাখতে হবে। শ্রমিককৃষকদের অধিকতর উৎপাদন

ক্ষমতায় অর্জিত সম্পদ যেন ব্যবস্থাপনায় নষ্ট না হয়ে যায়। উৎপাদিকা ও অনুৎপাদিকা শ্রমের মধ্যে অনুকূল অনুপাত রক্ষা করা গেলে শ্রমিক প্রতি অনুচ্চ উৎপাদনক্ষমতাসম্পন্ন অনগ্রসর দেশও শ্রমিককৃষকদের উচ্চতর উৎপাদনক্ষমতসম্পন্ন যেসব দেশে বৃহত্তর ব্যবস্থাপনায় অধিকতর অর্থ ব্যয়িত হয়, সেইসব দেশের তুলনায় অর্থনৈতিক বিকাশে ও জীবনমান উন্নয়নে সঞ্চিত সম্পদের সার্থকতর ব্যবহার করতে পারবে।

প্রত্যেক দেশেই ও সমগ্র পৃথিবী জুড়ে সমাজতন্ত্রের জয়লাভে শ্রমের উৎপাদনক্ষমতা গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। সমাজতন্ত্র যে শ্রমের উচ্চতর উৎপাদনক্ষমতার উপযুক্ত পরিবেশ রচনা করে, তাতেই বোঝা যায় যে ধনতন্ত্রকে শেষ পর্যন্ত পরাজিত করা যাবে, ধনতন্ত্র পরাভূত হবে।

প্রত্যেক সমাজেই শ্রমের নতুন সংগঠন কর্মের নতুন প্রণোদনা সৃষ্টি করে। এই ক্ষেত্রে বৈষয়িক সুযোগসুবিধা বিতরণের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। পুঁজিতন্ত্রে বুর্জোয়াশ্রেণী যেমন অন্যের শ্রম আত্মসাৎ করে, তেমনিই বণ্টনকালে যে বেশি পরিশ্রম করে সে নয়, যার পুঁজি বেশি সে-ই আয়ের বৃহদংশ পায়। উৎপাদন বৃদ্ধিতে মুনাফার লোভই বুর্জোয়াশ্রেণীর উৎসাহস্থল। শ্রমিক তাঁর কাজ পুঁজিপতির কাছে বেচতে বাধ্য হন, কারণ এই-ই তাঁর জীবন নির্বাহের একমাত্র পন্থা।

সমাজতান্ত্রিক সমাজে শ্রমজীবী মানুষেরাই প্রভু হয়ে উঠছেন, নিজেদের জন্যে কাজ করছেন, এই বোধই তাঁদের সর্বদা ক্রমবর্ধমান উৎসাহ যোগায়। কাজের পরিমাণ ও গুণের বিচারে আয় বণ্টনেও এই প্রণোদনারই বৈষয়িক রূপ। এইটিই সমাজবাদী শ্রম সংগঠনের মুখ্য লক্ষণ, কেননা এই বণ্টনই সকল সামাজিককে ফলপ্রদ কাজে টেনে আনার অন্যতম পন্থা।

বৈষয়িক উৎপাদনের চাহিদা থেকেই কাজ বিচার করে বণ্টনের

নীতির সূত্রপাত। অন্যভাবে বলতে গেলে এই নীতির চরিত্র বিষয়গত। সমাজতন্ত্রের ভিত্তি উৎপাদনের উপায় সমূহের সামাজিক মালিকানা; ফলে সমাজের কোন সদস্যই অপরকে বঞ্চিত করে জীবন নির্বাহ করতে পারে না।

সমাজতান্ত্রিক সমাজে প্রত্যেককেই কাজ করতে হবে। এই নিয়মেরই প্রকাশ ঘটেছে সেই নীতিতেঃ "যে কাজ করবে না, সে খেতে পাবে না।" কিন্তু প্রত্যেক সামাজিক তাঁর কাজের বিনিময়ে কতটা পাবেন? কোন কোন মানুষ বেশি দক্ষ, এক ঘণ্টার মধ্যে তাঁরা অনেক বেশি পরিমাণ বৈষয়িক সম্পদ উৎপাদন করতে পারেন। অন্যেরা কোন প্রশিক্ষণ লাভ করেন নি বা সামান্যই লাভ করেছেন। তাঁরা অদক্ষ শ্রমিকের কাজ করেন। কোন কোন ব্যক্তি বেশি পরিশ্রম করতে পারেন এবং অন্যদের চেয়ে বেশি ফল লাভ করেন। কেউ পরিশ্রমের কাজে আবার কেউ বা হালকা কাজে নিযুক্ত থাকেন। সমাজতন্ত্রে শ্রমের যান্ত্রিকীকরণের হার সব ক্ষেত্রে সমান নয়। ফলে বৈষয়িক উৎপাদনে দক্ষ ও অদক্ষ শ্রমের মধ্যে এবং বুদ্ধিগত ও কায়িক শ্রমের মধ্যে প্রভেদ থেকেই যাবে। তাই উৎপাদনের উন্নতি সাধনের লক্ষ্য স্মরণ রাখলে আয়বণ্টনকালে এই প্রভেদ সম্পর্কে অবহিত থাকতে হবে। সমাজতন্ত্রে আয়বণ্টন হয় প্রত্যেক শ্রমিকের কাজের পরিমাণ ও মান বিচার করে। কাজের মান যতই উঁচু, দক্ষতা যত বেশি, শ্রমিকের আয়ও ততই বেশি। এহেন বণ্টনব্যবস্থায় জনসাধারণ তাঁদের দক্ষতার উন্নতিসাধনে ও উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধিতে উৎসাহ পান। শ্রমিকের উৎপাদনক্ষমতা বিবেচনা না করে সমান আয় বণ্টন উৎপাদনের বিকাশ ও উন্নতিকেই ব্যাহত করত।

কাজ বিচার করে বণ্টন সমাজতন্ত্রের অন্যতম বিষয়গত অর্থনৈতিক

বিত্তি এবং বুর্জোয়া সমাজের বণ্টন ব্যবস্থার সঙ্গে এই বণ্টনের মৌলিক প্রভেদ বর্তমান। পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থায় শ্রমের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পেলে তাতে কেবল বুর্জোয়াশ্রেণীরই লাভ। বৈষয়িক সম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিক ও পুঁজিপতির মধ্যে দূরত্ব আরো বেড়ে যায়, জাতীয় আয়ে বুর্জোয়াশ্রেণীর অংশ বাড়তে থাকে, শ্রমজীবী জনতার অংশ কমতে থাকে। সমাজতন্ত্রে শ্রমের উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ালেই আয় বাড়ে, জীবননির্বাহের সাধারণ মানের উন্নতি ঘটে।

কিন্তু সমাজতন্ত্রেও জনসাধারণ তাঁদের পরিশ্রমের সম্পূর্ণ প্রতিফল লাভ করেন না। কোন ব্যক্তি যা উৎপাদন করেন, তার সবটাই যদি তাঁরই সম্ভোগে দান করা হয়, তবে উৎপাদনের প্রসার ঘটাবার, নতুন কারখানা ও রাস্তা গড়বার, জনসাধারণকে শিক্ষার সুযোগ দেবার, হাসপাতাল তৈরি করবার, প্রশাসন যন্ত্র চালু রাখবার, বয়স্কদের যত্ন নেবার বা শিশুপ্রতিষ্ঠানে, বিদ্যালয়ে ও উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অল্পবয়সীদের মানুষ করে তুলবার মত রসদ সমাজের হাতে থাকবে না। তাই শোষণহীন সমাজতান্ত্রিক সমাজে কাজের মধ্যে আবশ্যকীয় ও উদ্বৃত্ত দু'ধরনের শ্রমই অন্তর্গত। আবশ্যকীয় শ্রমের সম্পদে জনসাধারণের খাদ্য, বস্ত্র, গৃহ, ও সংস্কৃতির চাহিদা মেটানো হয়। উদ্বৃত্ত শ্রমের সম্পদে সামাজিক চাহিদা মেটানো হয়, উৎপাদনের প্রসার সাধনে ও সামাজিক সম্ভোগে তা কাজে লাগে।

কাজের পরিমাণ ও মান হিসেবে সম্পদবণ্টনে প্রত্যেক শ্রমিকের কাজের যথাযথ হিসেব রাখতে হয়। বৈষয়িক উৎপাদনের কোন ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তির শ্রমের প্রতিফল শুধু ক' মিটার কাপড় বা ক' টন কয়লা, এমনি স্বাভাবিক সূচকে ধরা যাবে না, দামের হিসেবেও ধরতে হবে,

কারণ অর্থই সকল ধরনের শ্রমের সাধারণ পরিমাপ। রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানে টাকার অঙ্কেই বেতন দেওয়া হয়। কেউ বলতে পারেন, পুঁজিতান্ত্রিক সমাজেও তো মেহনতি মানুষ টাকার অঙ্কেই বেতন পান। তাহলে সমাজতন্ত্রে বেতনের সঙ্গে পুঁজিতন্ত্রে বেতনের তফাৎ কোথায়? বাইরে থেকে একই রকম মনে হলেও আসলে দুয়ের সারবস্তুই আলাদা। পুঁজিপতিদের জন্য যাঁরা কাজ করেন, তাঁদের বেতন তাঁদের শ্রমের মনের দ্বারা নির্ধারিত হয় না, শ্রমের খরচা হিসেবে নির্ধারিত হয়, কারণ শ্রমিক তাঁর শ্রম পণ্য রূপে কারখানা বা মিলের মালিকের কাছে বেচতে বাধ্য হন। সমাজতন্ত্রে জনসাধারণ নিজেদের জন্য ও যে-সমাজে তাঁরা বাস করেন, তারই জন্য কাজ করেন; উৎপন্ন যাবতীয় সম্পদের তাঁরাই অধিকারী, তাঁদের বেতন তাঁদের কাজের জন্য প্রাপ্য জাতীয় আয়ের নির্দিষ্ট অংশ। সমাজতান্ত্রিক সমাজে বেতন নির্ভর করে মুখ্যত প্রত্যেক শ্রমিকের ও সমগ্র সমাজের শ্রমের উৎপাদন ক্ষমতার মানের উপর।

শ্রমের উৎপাদন ক্ষমতা বাড়লেই শ্রমিকদের আয় বাড়ে। উদাহরণত সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৪০-'৬০-এর মধ্যে শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিক প্রতি শ্রমের উৎপাদন ক্ষমতা প্রায় তিন গুণ বৃদ্ধি পায়, শিল্পে, অফিসে ও অন্যত্র কর্মরত শ্রমিক কর্মচারীদের আসল আয় শতকরা ১১০ ভাগ বেড়ে যায়। আরেকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। ফ্রান্সে ১৯৩৭-'৫৭র মধ্যে শ্রমের উৎপাদন ক্ষমতা শতকরা ৫৬ ভাগ বৃদ্ধি পায়। অথচ আসল আয় তো বাড়েই না, বরং শতকরা ৩৪ ভাগ হ্রাস পায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৪০-'৫৮র মধ্যে শ্রমের উৎপাদন ক্ষমতা শতকরা ৫৪ ভাগ বৃদ্ধি পায়, অথচ আসল আয় বাড়ে শতকরা মাত্র ৬ ভাগ। শ্রমের উৎপাদন ক্ষমতার সঙ্গে বেতনের প্রত্যক্ষ নির্ভরশীল সম্পর্ক, কাজ অনুযায়ী সমাজবাদী বণ্টনের বিশিষ্ট লক্ষণ।

সমাজতান্ত্রিক সমাজে বণ্টনের আরেকটি লক্ষণ এই যে, জনমণ্ডলীর আয় বলতে শুধু কাজের জন্য পাওয়া বেতনই বোঝায় না, সামাজিক সম্ভোগ তহবিল থেকে প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধা (হাসপাতাল, স্বাস্থ্য ও অবসরনিবাস, কিণ্ডারগার্টেন ও নার্সারি, তরুণ পাইওনীয়ার শিবির) এবং বেতন ছাড়াও এমনি বাড়তি সুযোগ) ও ভাতাও আয়ের অন্তর্গত। উদ্বৃত্ত সম্পদই সামাজিক সম্ভোগ তহবিলের উৎস। এতেই প্রত্যয়সিদ্ধ-ভাবে বোঝা যায় যে সমাজতান্ত্রিক সমাজে আবশ্যকীয় ও উদ্‌বৃত্তের মধ্যে শ্রম বণ্টন তেমন অনড় নয়, কারণ প্রত্যেক শ্রমিক তাঁর শ্রমের প্রতিফল থেকে সমাজকে যা দান করেন, তা শেষ পর্যন্ত সামাজিকদের কাছেই ফিরে আসে।

সামাজিক সম্ভোগ তহবিল জাতীয় আয়ের সেই নির্দিষ্ট অংশ যা শ্রমের জন্য প্রদত্ত বেতন ছাড়াও বিনা মূল্যে কিংবা স্বল্প মূল্যের বিনিময়ে সামাজিকদের চাহিদা পূরণ করে।

উদাহরণত সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৬০ সালে এই তহবিল থেকে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক চাহিদা পূরণে জন প্রতি গড়পড়তা ৮৫·৭ রুব্‌ল ব্যয় করা হয়েছিল। এই তহবিল দ্রুত বৃদ্ধি পায়। ১৯৪০-'৬০-এর মধ্যে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে এই তহবিল ৪২০ কোটি থেকে বেড়ে ২৪৫০ কোটি হয়ে দাঁড়ায়। অবশ্য কমিউনিজম নির্মাণের সমগ্র পর্ব জুড়ে শ্রমের বিনিময়ে প্রাপ্ত বেতনই হবে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের জনমণ্ডলীর প্রধান আয়।

শ্রমের বিনিময়ে টাকার অঙ্কে প্রাপ্ত বেতন ভোগ্য পণ্য ক্রয়ে ব্যয়িত হয়। এই ভোগ্য পণ্যই সমাজতান্ত্রিক সমাজের সামাজিকদের একমাত্র ব্যক্তিগত সম্পত্তি। সমাজতন্ত্র ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপ ঘটায় না। যেহেতু মানুষ আর মানুষকে শোষণ করে না, ব্যক্তিগত সম্পত্তিও আর পুঁজিতে রূপান্তরিত করা যায় না, যদিও তার বৃদ্ধি ঘটতে পারে, ঘটেও

থাকে। এই ভোগ্য পণ্য বলতে বোঝায় খাদ্য, বস্ত্র, ঘরের আসবাব-পত্র; ছোট বাড়ি, গাড়ি, মোটর সাইকেল (এগুলি মুনাফার উৎস রূপে ব্যবহৃত হয় না) এবং দীর্ঘকালীন ব্যবহারোপযোগী দ্রব্যাদি। সমাজ-তন্ত্রে জীবনমানের উন্নতির পরিচয় পাওয়া যায় শুধু বিদ্যালয়, হাস-পাতাল, বাড়ি, দোকান ও প্রেক্ষাগার নির্মাণেই নয়, ব্যক্তিগত আয় বৃদ্ধিতেও।

অর্থনীতির অন্য যে কোন ক্ষেত্রের তুলনায় বিষয়গত অর্থনৈতিক বিধি লঙ্ঘনের সম্ভাবনা বণ্টনের ক্ষেত্রেই সমধিক। সোভিয়েত যুক্ত-রাষ্ট্রে সমাজবাদী বিকাশের দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় এবং অন্যান্য দেশের সমাজ-তান্ত্রিক নির্মাণের প্রয়োগ ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে অর্থনীতির পরিকল্পিত ব্যবস্থাপনায় কাজ অনুসারে বণ্টনের নীতি কখনও কখনও সুপ্রযুক্ত হয় না বা সরাসরি লঙ্ঘিত হয়।

উদাহরণত কোন দেশে যদি উৎপাদনের প্রসার, নতুন কারখানা, রাস্তা, বিদ্যালয়, হাসপাতাল, খেলার স্টেডিয়াম নির্মাণ, ইত্যাদি সামাজিক চাহিদা মিটিয়ে যা উদ্‌বৃত্ত থাকে তাই নিয়েই ব্যক্তিগত সম্ভোগ তহবিল সৃষ্টি হয়, তাতে এই নীতি লঙ্ঘিত হবে। এই ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত সম্ভোগ তহবিল এতই সামান্য হবে যে প্রত্যেক শ্রমিকের কাজ অনুসারে করে বণ্টন করলেও এক একজনের ভাগে যা পড়বে তাতে তাঁর সবচেয়ে জরুরী চাহিদাই পূরণ হবে না। এরকম ঘটলে ভালো করে কাজ করবার বা শ্রমের উৎপাদন ক্ষমতা বাড়াবার কোন তাগিদই শ্রমিক অনুভব করবেন না। তাই কৃত কর্মের সঙ্গে বণ্টনের যথার্থ সামঞ্জস্য বিধান করতে গেলে উৎপাদন বিস্তারে সমগ্র রাষ্ট্রিক ব্যয় ও সামাজিক সম্ভোগের চাহিদা মেটাবার পর যা উদ্‌বৃত্ত থাকে শুধু তা থেকে ব্যক্তিগত সম্ভোগ তহবিল সৃষ্টি করলে চলবে না, শ্রমের উৎপাদন ক্ষমতা ও জাতীয় আয়ের বৃদ্ধির সঙ্গে সংগতি রেখেই এই তহবিল সৃষ্টি

করতে হবে। প্রত্যেক দেশের বিশেষ পরিস্থিতি স্মরণ রেখেই বৃদ্ধির শতকরা হারের এক নির্দিষ্ট হিসেবে ব্যক্তিগত সম্ভোগ তহবিলের আনুপাতিক বৃদ্ধি ঘটানো উচিত।

কাজের ভিত্তিতে বণ্টনের নীতি লঙ্ঘন করা হলে সমাজবাদী শিল্পব্যবস্থাপনার অন্যতম মৌলিক নীতি—প্রত্যেক শ্রমিককে তাঁর কাজের জন্য বৈষয়িক প্রণোদনা যোগানো—লঙ্ঘন করা হয়, এবং ফলস্বরূপ সমগ্র অর্থনীতির বিকাশ ব্যাহত হয়। সমাজতন্ত্রে যে বৈষয়িক প্রণোদনা যোগানো হয়, তার সঙ্গে পুঁজিপতি ও খুদে মালিকদের মুনাফার লালসার কোন সম্পর্ক নেই। সমাজবাদী সমাজের প্রত্যেক সামাজিকের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের একমাত্র উৎস কাজ। ফলে প্রত্যেক ব্যক্তি ও প্রত্যেক গোষ্ঠীর স্বার্থ সমগ্র সমাজের স্বার্থের সঙ্গে মিলে যায়।

বৈপ্লবিক বিশ্বদৃষ্টির শুদ্ধতা রক্ষার নামে বৈষয়িক প্রণোদনার সমাজবাদী চারিত্র্য অস্বীকার করার অর্থ জনসাধারণের গভীরতম স্বার্থ সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করা এবং তাঁদের উৎপাদনের মালিকানার বোধ দমন করে উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির উৎসাহও দমিত করা।

কাজের ভিত্তিতে বণ্টনের নীতি অগ্রাহ্য করলে সমাজতন্ত্রের নীতি ও আদর্শই বিকৃত হয়। উৎপাদন সম্পর্কে উদ্বেগের ছুতোয় প্রায়ই এই নীতি লঙ্ঘিত হয়, কিন্তু এহেন "উদ্বেগে" ক্ষতিই হয়, কারণ উৎপাদন অচল হয়ে পড়ে।

কিংবা এমন ক্ষেত্র ধরুন যেখানে শ্রমের উৎপাদনক্ষমতার স্তর বা বৈষয়িক সম্পদ কতটা পাওয়া যায়, তা হিসেব না করেই সমগ্র সম্ভোগ তহবিল এবং শ্রমের ব্যক্তিগত মূল্য ধরে ফেলা হয়। এরকম ক্ষেত্রে জনসাধারণের সুখস্বাচ্ছন্দ্য সম্পর্কে আগ্রহের নামে সামাজিক উৎপাদন ও বণ্টনের বৈষয়িক অবস্থা অবহেলা করা হয়েছে।

কার্যত এতে জাতীয় সম্পদেরই টান পড়ল, অর্থাৎ গাছের ডালে বসে সেই ডালেই কোপ দেওয়া হল। শ্রমের উৎপাদনক্ষমতার স্তরের সঙ্গে সংগতি না রেখেই শ্রমের দাম মেটাতে গেলে জনসাধারণের সুখস্বাচ্ছন্দ্য সম্পর্কে আগ্রহ প্রকাশ পায় না, বরং সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির ভিত্তিই দুর্বল করে দেওয়া হয়। বৈষয়িক সুবিধার উন্নতি ঘটার আগেই শ্রমের দাম দিতে গিয়ে মাত্রাতিরিক্ত ব্যয়ের ফলে অনিবার্যভাবেই মুদ্রাস্ফীতি ও অর্থনৈতিক বিপর্যয় ঘটে।

অধিকতর ক্ষেত্রে যা ঘটে তা হল সমাজে সকলের মধ্যে আয় সমানভাবে বাঁটোয়ারা কারর চেষ্টায় কাজের ভিত্তিতে বণ্টনের নীতি লঙ্ঘন করা হয়। একেই কখনও কখনও যথার্থ সমাজবাদী ও এমনকি কমিউনিস্ট বণ্টন ব্যবস্থা বলে বর্ণনা করা হয়। কার্যত অবশ্য এটি বৈষয়িক সামাজিক উৎপাদনের আসল অবস্থার পরিপন্থী হয় এবং তার বিকাশ ব্যাহত করে।

সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে যৌথকরণের আদিপর্বে বহু যৌথ খামারে সদস্যেরা খামারে কাজ করেন কিনা বিচার না' করেই, সমগ্র আয় সমান ভাবে ভাগ করে দেওয়া হয়। কোন কোন যৌথ খামারে যৌথ খামারীরা যে কাজ করতে এসেছেন, শুধু তারই ভিত্তিতে আয় বণ্টন করে দেওয়া হয়। প্রত্যেক সদস্য কতটা কাজ করলেন বা সামাজিকীকৃত অর্থনীতির বিকাশে তাঁর কতটা অবদান, তা আর বিচার করা হল না। অন্য কয়েকটি যৌথ খামারে পরিবারের আয়তন অনুসারে সদস্যদের মধ্যে আয় বণ্টন করা হয়। এতে যারা ফাঁকি দেয় তারাও যৌথ খামার থেকে যারা কাজ করে তাদের সমান আয় ভোগ করার সুযোগ পায়, শেষ পর্যন্ত যারা কাজ করে তারা সামাজিক উৎপাদনে আগ্রহই

হারিয়ে ফেলে। বণ্টনের যেখানে কোন বাছ বিচার নেই, সেখানে যৌথ খামার উৎপাদন ক্ষমতা বাড়াতে পারে না উৎপাদনের মাত্রাও বাড়াতে পারে না এবং অল্প সময়ের মধ্যেই সমাজবাদী প্রতিষ্ঠান হিসেবে বদনামের ভাগী হয়।

কাজের ভিত্তিতে বণ্টনের নীতি শোষণধর্মী সমাজের লক্ষণস্বরূপ, ভূস্বামী ও কৃষক এবং পুঁজিপতি ও শ্রমিকের মধ্যে বৈষম্যসহ সকল বৈষম্যের বিলোপ ঘটায়। কিন্তু এই বণ্টন আয়ের ক্ষেত্রে এবং তারই ফলস্বরূপ সমাজতান্ত্রিক সমাজের সদস্যদের মধ্যে জীবন-মানের ক্ষেত্রে বৈষম্য বজায় রাখে। পুঁজিতান্ত্রিক সমাজে মুষ্টিমেয় শোষক এবং মেহনতি জনতার জীবনমানের মধ্যে বৈষম্যের যে গভীর ব্যবধান, কাজের ভিত্তিতে আয়বণ্টন হেতু জীবনমানের বৈষম্যের বিস্তীর্ণতম ব্যবধানও তার সঙ্গে তুলনীয় নয়। পুঁজিতান্ত্রিক সমাজে এই ব্যবধান প্রশস্ততর হয়; অন্যদিকে সমাজতান্ত্রিক সমাজে জনসাধারণের বিভিন্ন অংশের মধ্যে জীবনমানের অসমতা ক্রমশই কমে আসতে থাকে।

সাধারণত সমাজতন্ত্রে জনসাধারণ তাঁদের দক্ষতা বাড়াতে থাকলে তাঁদের শ্রমের উৎপাদনক্ষমতা বাড়িয়ে চললে, অর্থাৎ তখনও কাজের ভিত্তিতে বণ্টনের মধ্য দিয়েই নাগরিক ও গ্রামীণ জনমণ্ডলীর বিভিন্ন অংশের মধ্যে আয় ও জীবনমানের অসমতা কমে আসে। শ্রমের উৎপাদনক্ষমতা ও ভোগ্য পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পেলে সরকার দক্ষতা বা ব্যক্তিগত উৎপাদনক্ষমতা বিচার না করেই স্বল্পবেতনভুক শ্রমিকদের বেতন বাড়িয়ে দেন। তবু কাজের ভিত্তিতে বণ্টনই সমাজতান্ত্রিক সমাজে আয়বণ্টনের প্রধান নীতিরূপে বলবৎ থাকে।

আয়ের ব্যবধান কমিয়ে আনতে সামাজিক সম্ভোগ তহবিল সহায়ক হয়। অল্পবেতনভুক শ্রমিকেরা বেশি সুযোগসুবিধা লাভ

করেন; এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য নার্সারি; কিণ্ডারগার্টেন ও তরুণ পাইওনীয়ার শিবিরে তাদের সন্তানসন্ততির স্থান নির্দিষ্ট থাকে। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে জনসাধারণ সামাজিক সম্ভোগ তহবিল থেকে যে সুযোগসুবিধা লাভ করেন তার দাম কাজের জন্য প্রাপ্ত আয়ের গড়পড়তা শতকরা ২৫ ভাগের সমান; স্বল্পবেতনভুক শ্রমিকদের ক্ষেত্রে এর পরিমাণ দাঁড়ায় আয়ের শতকরা ৩৫ থেকে ৪৫ ভাগ আয়ের সমতা ও জীবনমানের সমতা সৃষ্টির প্রধান ও সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য পন্থা অবশ্য উৎপাদিকা শক্তিসমূহের বিকাশ সাধন, সমাজের প্রত্যেক সদস্যের বৃত্তিগত দক্ষতার উন্নতিসাধন এবং শ্রমের উৎপাদনক্ষমতা বৃদ্ধি।

সমাজের সকল সদস্যের আয়ের সমতা সৃষ্টির যে চেষ্টা সময়ে সময়ে দেখা যায় তাতে সাধারণভাবে প্রতিফলিত হয় পশ্চাৎপদ উৎপাদনের প্রভাব এবং শ্রমিকদের নিম্নমানের দক্ষতা, এই শ্রমিকেরা সমান বণ্টনকেই তাঁদের জীবনমানের উন্নতিসাধনের একমাত্র সম্ভাব্য পন্থা বলে গ্রহণ করেন। কিন্তু এ ধরনের চিন্তা বিভ্রান্তিকর, কারণ সমান বণ্টনের নীতি উৎপাদন ও জীবনমানকে জড়ত্বের রসাতলে ঠেলে দেয়।

বণ্টনের নীতি ও পন্থা সামাজিক উৎপাদনের স্তর ও সংগঠন থেকে উদ্ভূত হয়, এবং তার চরিত্রও বিষয়গত। যতই সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত হোক, কাজের ভিত্তিতে বণ্টনের সমাজবাদী নীতি লঙ্ঘিত হলেই অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, উৎপাদকের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হয়। ঐ নীতি নিষ্ঠার সঙ্গে প্রয়োগ করলে সমাজতান্ত্রিক সমাজ শক্তিশালী হয়, এবং তাকে কমিউনিজ্‌ম-এর দিকে অগ্রসর করে।

৮। সমাজবাদী জাতিসংঘ

পঁচিশ বছরেরও বেশি সময় ধরে তরুণ সোভিয়েত রাষ্ট্র পুঁজিবাদী বেষ্টনীর মধ্যে একা সমাজবাদের সাফল্যের জন্য লড়াই করে গেছে। তার লক্ষ্য ছিল নতুন সমাজ গঠন এবং নতুন সৃষ্টিকে বাঁচিয়ে রাখা। সোভিয়েত ইউনিয়ন যেন এক শ্রমিক, এক হাতে বাড়ি গাঁথছে, অন্য হাতে নিজের প্রিয় সম্পদকে সশস্ত্র শত্রুর নজর থেকে রাইফেল হাতে রক্ষা করছে।

নতুন সমাজের ভিত্তি স্থাপন সমাধা হলে, অথচ সমাজতন্ত্রের সমগ্র সৌধ নির্মাণ সমাপ্ত হবার আগেই সোভিয়েত জনসাধারণকে তাদের কাজ ব্যাহত করে জার্মান নাৎসিবাদের বিতাড়নের কাজে লাগতে হল। সোভিয়েত ইউনিয়ন পেশী শক্ত করে দাঁড়িয়ে নাৎসি বাহিনীর গতিরোধ করেই ক্ষান্ত হয় নি, তাদের পরাভূত করে বহু ইয়োরোপীয় জাতিকে মুক্ত করেছে। নাৎসিবাদের বিরুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের জয়লাভে সারা পৃথিবীর জাতিসমূহের কাছে সমাজবাদী ব্যবস্থার ক্ষমতা ও প্রাণশক্তি প্রমাণ হয়ে গেল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর সেই জয়ের প্রভাবেই ইয়োরোপ ও এশিয়া এবং পরে লাতিন আমেরিকা ও আফ্রিকার কয়েকটি দেশ সমাজবাদের পথ গ্রহণ করল। অর্থনীতির এক বিশ্ব সমাজবাদী ব্যবস্থা গড়ে উঠল। এতে যেমন সমাজবাদের প্রভাব, প্রাণশক্তি ও আকর্ষণ প্রমাণ হল, তেমনই এই ঘটনাই হল বর্তমান যুগে সমাজবাদের বিকাশের প্রধান ফল।

সমাজবাদী দেশগুলির মধ্যে সম্পর্কের ভিত্তি এক দেশ কর্তৃক অন্য দেশের উপর অধিকার কায়েম বা কোনরূপ বাধ্যবাধকতা নয়। এই সম্পর্কের ভিত্তি স্বাধীন ইচ্ছা এবং সমাজবাদী জাতিসংঘের মধ্যে প্রত্যেক দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতি।

একই ভাবে প্রত্যেক দেশে যেমন সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকালে কে কাকে হারায় বলে নতুন ও পুরানোর মধ্যে লড়াই চলে, তেমনিই অর্থনীতির দুই বিশ্ব ব্যবস্থার মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্ব আধুনিক সমাজের সামাজিক বিকাশের ভিত্তি।

উৎপাদনের প্রগতিশীল ধরন জনসাধারণের স্বার্থে তাঁদেরই পূর্ণ সমর্থনে ও সক্রিয় সহযোগে স্বতন্ত্রভাবে প্রত্যেক দেশের অভ্যন্তরে ও সারা বিশ্ব জুড়ে জয়যুক্ত হয়।

বিশ্ব পুঁজিতান্ত্রিক অর্থনীতির তুলনায় বিশ্ব সমাজবাদী ব্যবস্থার অনেক সুবিধা আছে। প্রত্যেক দেশেই সমাজতন্ত্রের বিকাশ ও বলবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই উৎপাদনের উপায়সমূহের সরকারী মালিকানা সমগ্র সমাজ-বাদী দেশসংঘের অর্থনৈতিক ভিত্তি হয়ে দাঁড়ায়, দেশগুলিকে এই জাতি-সংঘের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ করে এবং তাদের মধ্যে সংযোগ ঘনিষ্ঠতর করে। আজ বিশ্ব সমাজবাদী ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত সকল দেশের অর্থনীতির সকল শাখাতেই সমাজবাদী ব্যবস্থার প্রাধান্য।

অর্থনীতির সকল শাখায় সরকারী মালিকানার প্রাধান্যে সমাজ-বাদী দেশগুলি ঐক্যবদ্ধ হয়, তারা পরিকল্পনানুসারে দ্রুত বিকাশ লাভের সুযোগ পায়। উদাহরণত ১৯৩৭ থেকে ১৯৬২ এর মধ্যে এই দেশগুলির মোট উৎপাদন প্রায় শতকরা ৭০০ ভাগ বৃদ্ধি পায়, অথচ ঐ একই সময়ের মধ্যে পুঁজিতান্ত্রিক দেশে উৎপাদন বেড়েছে মাত্র শতকরা ১৭০ ভাগ। স্বল্পাগ্রসর দেশগুলিতেই শিল্প বিকাশের গতি বিশেষভাবে দ্রুত ছিল। বুলগেরিয়ায় শিল্পোৎপাদন বাড়ে ১৯৩৯ এর তুলনায় শতকরা ১৪০০ ভাগ, মোঙ্গোলিয়ায় ১৯৩৭ এর তুলনায় শতকরা ২৯০০ ভাগেরও বেশি। বর্তমানে বিশ্বের সমগ্র শিল্পোৎপাদনের শতকরা ৩৮ ভাগ উৎপন্ন হয় সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে; ১৯৭০ সালে এই অনুপাত দাঁড়াবে শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ, ১৯৮০ সালে প্রায় শতকরা ৬৭ ভাগ।

ফলে বৈষয়িক উৎপাদনের এই নিয়ামক শাখায় সমাজতন্ত্র পুঁজিতন্ত্র থেকে এগিয়ে থাকবে।

পুঁজিতন্ত্রের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বে জয়যুক্ত হতে গেলে সমাজবাদী দেশগুলিকে দেশের মধ্যে ও সমগ্র বিশ্ব সমাজবাদী ব্যবস্থার কাঠামোর মধ্যে সমাজতন্ত্রের সুবিধাসমূহের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করতে হবে। পুঁজিতন্ত্রের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় সময় বাঁচাতে তাঁরা তাঁদের অর্থনৈতিক বিকাশ পরিকল্পনাগুলি সংহত করে উৎপাদন সহযোগ ও বিশেষীকরণের বলিষ্ঠ পন্থা কাজে লাগাতে পারে।

আন্তর্জাতিক পুঁজিতান্ত্রিক শ্রমবণ্টন বিভিন্ন দেশের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বের ধারায় বিশৃঙ্খলভাবে বিকশিত হয় এবং বলশালী রাষ্ট্র কর্তৃক দুর্বল দেশের শোষণের পন্থা গ্রহণ করে। অন্যদিকে আন্তর্জাতিক সমাজবাদী শ্রমবণ্টন পরিকল্পনানুগ। এই শ্রমবণ্টন প্রত্যেক দেশের বিশিষ্ট লক্ষণ এবং তার প্রকৃতিজ ও অর্থনৈতিক সামর্থ্য বিবেচনা করে সমগ্র সমাজবাদী শিবির ও প্রত্যেক সদস্য দেশের স্বার্থে উৎপাদিকা শক্তিসমূহের সর্বাধিক সময়োপযোগী ও কার্যকর বিকাশ নিশ্চিত করে। সমাজবাদী দেশগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক সম্পর্কের ভিত্তি পারস্পরিক সহযোগ ও পারস্পরিক উপকার।

সমাজবাদী দেশগুলির মধ্যে শ্রমবণ্টন যেহেতু পরিকল্পনানির্ভর সেইহেতু প্রত্যেক দেশের পক্ষে আধুনিক শিল্পের সকল শাখার বিকাশসাধনের প্রয়োজন পড়ে না। একটি দেশ কেবল সেই শাখাগুলিকে বিকশিত করে তুলবে যাতে স্বল্পতর ব্যয়ে অধিকতর পরিমাণে উন্নততর মানের দ্রব্য উৎপন্ন হবে। কোন দেশের একপেশে বিকাশ আগে ঘটত, আন্তর্জাতিক সমাজবাদী শ্রমবণ্টনে তা এড়ানো সম্ভব হয়। সব দেশই উৎপাদনের প্রয়োজনীয় শাখাগুলির বিকাশে শিল্পোন্নতহয়ে উঠে।

আধুনিক যন্ত্রপাতি তথা উৎপাদনের যন্ত্রায়ন ও স্বয়ংক্রিয়করণ-ই বিভিন্ন পণ্যের বিপুল পরিমাণ উৎপাদন সম্ভব করে, ফলে সামাজিক শ্রম অনেকটা বাঁচে। এমন বিপুল পরিমাণে উৎপাদন ঘটলে বিরাট বাজারের দরকার হয়। সমাজবাদী দেশগুলির উৎপাদন পরিকল্পনাগুলির মধ্যে সমন্বয় আধুনিক উৎপাদনব্যবস্থায় অপরিহার্য বোধ হয়। উদাহরণত এনজিনীয়ারিং শিল্পে সমাজবাদী দেশগুলি এ-বিষয়ে একমত হয়েছেন যে এক ধরনের মোটর গাড়ি কেবল পোল্যাণ্ডে উৎপন্ন হবে, আরেক ধরন কেবল চেকোশ্লোভাকিয়ায়, আরেক ধরন কেবল জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে। সব সমাজবাদী দেশই তাদের স্বল্পায়তন রোলিং মিল পায় পোল্যাণ্ড ও জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে, এবং বৃহদায়তন মডেল সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র ও চেকোশ্লোভাকিয়া থেকে। খামারের যন্ত্রপাতি, মেশিনটুল ও অন্যান্য উৎপাদনোপকরণ সম্পর্কেও অনুরূপ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র বহু সমাজবাদী দেশেই আকরিক লোহা, কয়লা ও পেট্রোলিয়ম যোগান দেয়।

সমাজবাদী দেশসমূহের মধ্যে অর্থনৈতিক সহযোগের এক উল্লেখ্য দৃষ্টান্ত অতিকায় মৈত্রী তৈল পাইপলাইন নির্মাণ। এই পাইপলাইনে সোভিয়েত পেট্রোলিয়াম পোল্যাণ্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া, জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র ও হাঙ্গেরিতে চালান যায়। রেলপথে পরিবহনের তুলনায় এতে অনেক কম খরচ পড়ে।

এইভাবেই আন্তর্জাতিক সমাজবাদী শ্রমবণ্টন, উৎপাদন সহযোগ ও বিশেষীকরণের সহায়তায় অর্থনৈতিক বিকাশের গতি বৃদ্ধি হয়। বিভিন্ন দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক স্তরের বহু যুগলালিত বৈষম্য মুছে যায়, শ্রমের উৎপাদনক্ষমতা বাড়ে, জীবনমানের উন্নতি হয়।

শ্রমবণ্টনে উৎপাদিকা শক্তিসমূহের স্তর বোঝা যায় ও তার বিকাশ-

সাধনেরও উপায় ঐটিই। আধুনিক শিল্পের বিকাশে এই শ্রমবণ্টন বিষয়গতভাবে অপরিহার্য। কোন কোন দেশ নিজেরাই সবকিছু করতে যাওয়ায় তাদের বিকাশের গতি ব্যাহত হয়েছে, বৈষয়িক উপায়-সমূহ ও লোকবলের অযথা বিনিয়োগ ঘটেছে। অন্যদিকে সহযোগ প্রত্যেক দেশে ও সারা বিশ্ব জুড়ে সমাজবাদের জয়যাত্রাকে ত্বরান্বিত করেছে।

যেসব প্রাক্তন উপনিবেশ সমাজতান্ত্রিক নির্মাণের পথে যাত্রা শুরু করেছে, তাদের ক্ষেত্রে পরস্পরের পক্ষে সুবিধাজনক শর্তে বাণিজ্য, উৎপাদন, সহযোগ ও অন্যান্য অর্থনৈতিক সম্পর্ক গড়ে তোলা আরো প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ। এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার জনগণের মুখ্য স্বার্থসমূহ বিশ্ব সমাজবাদী দেশসংঘের স্বার্থের সঙ্গে সম্পূর্ণ মিলে যায়। এই দেশগুলি সমাজবাদী শিবিরের অর্থনৈতিক ক্ষমতা এবং পারস্পরিক সহযোগ ও সহায়তার সুযোগ গ্রহণ করে যথার্থ স্বাধীনতা, সাম্য ও স্বয়ংভরতা অর্জন করতে পারে এবং নিজেদের জনগণের স্বার্থানুগ নতুন সমাজ গড়তে পারে। সমাজবাদী ও অনগ্রসর দেশ-গুলির মধ্যে পরিকল্পনানুগ সুদৃঢ় অর্থনৈতিক সহযোগে শেষোক্ত দেশগুলি এক স্থিতিশীল বাজার, মূল্যমানের নির্দিষ্ট স্তর, রসদ সংগ্রহের নির্ভরযোগ্য উৎস, কৃৎকৌশলগত সাহায্য, যন্ত্রপাতি ও উপকরণাদি লাভ করে; এই সুযোগ সুবিধা ছাড়া তাদের ভবিষ্যৎ বিকাশ কল্পনাতীত ছিল। সোভিয়েত কৃৎকৌশলগত সহায়তায় এশীয় ও আফ্রিকান দেশসমূহে ৫০০টিরও বেশি শিল্প ও অন্য প্রকল্প নির্মিত হচ্ছে। এর মধ্যে আছে লৌহঘটিত ও অ-লৌহঘটিত ধাতুশিল্প কারখানা, ধাতুকর্ম, এন্‌জিনীয়ারিং ও রাসায়নিক কারখানা, তৈল শোধনাগার ও শক্তিকেন্দ্র। অন্য সমাজবাদী দেশগুলি এইসব দেশে ৪০০টির বেশি গুরুত্বপূর্ণ শিল্পপ্রকল্প নির্মাণে সহায়তা করছে।

আফ্রিকান ও সমাজবাদী দেশগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক সম্পর্কের শক্তিতে আফ্রিকান দেশগুলি তাদের ঔপনিবেশিক কাঠামো ভেঙে ফেলে যথার্থ মুক্তি ও স্বাধীনতা অর্জন করতে পারছে।

বিশ্ব সমাজবাদী ব্যবস্থা সামাজিক ক্রিয়াকর্মের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র, বৈষয়িক উৎপাদনের ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে একটির পর একটি আঘাত হেনে পৃথিবীতে নতুন সমাজব্যবস্থার জয়-যাত্রায় ক্রমশই নিয়ামক ভূমিকা পালন করছে। বিশ্ব জুড়ে পুঁজিতন্ত্রের বিরুদ্ধে জয়লাভ সম্ভব হতে পারে কেবলমাত্র বিশ্ব সমাজবাদী ব্যবস্থা, পুঁজিতান্ত্রিক দেশে শ্রমিক আন্দোলন ও জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের যৌথ প্রয়াসের মধ্য দিয়েই। পুঁজিতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সমাজবাদী জাতিসংঘ সমগ্র মানবসমাজের সম্মুখে প্রজ্জ্বলিত আলোকবর্তিকা মাত্র নয়, সমাজবাদের বিশ্বব্যাপী সাফল্যের সহায়ক প্রচণ্ড বৈষয়িক শক্তিও।